বনফুলের নূতন গল্প

ভবানী মুখোপাধ্যায়

পরিচয় পাবলিশার্স

প্রথম প্রকাশ :
৭ই সেপ্টেম্বর, '৬১ ইং

প্রকাশক :
পরিচয় পাবলিশার্স
৩/১, নফর কোলে রোড,
কলিকাতা-১৫

মুদ্রাকর :
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
নিরুপমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩/১, নফর কোলে রোড,
কলিকাতা-১৫

একটি কিউরিও

'সে গল্পটি লিখতাম না। সকলকে সাবধান করবার জন্যই
...কোনও অচেনা দোকান থেকে অপ্রচলিত মূল্য দিয়ে কোনও
...বেন না। চেনা দোকান থেকে নগদ টাকা দিয়ে জিনিস
...আর এলো।

...স্ত্রীলোক। ইচ্ছে করেই আমার নামটা গোপন রাখছি।
...ছি তা গল্পটা পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন।

...ার বয়স তখন ষোলো। বাবার একমাত্র সন্তান আমি।
...রত গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। প্রায়ই তাঁকে
...বাইরে যেতে হ'ত। ইয়োরোপের নানা দেশে, আমেরিকায়
...ইজিপ্টেও যেতেন তিনি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন।
...নাটি বলছি সেটি কায়রো শহরে ঘটেছিল। বাবা একদিন
...বললেন—'আমি একটা জরুরী 'কেব্‌ল' পেয়েছি। আজই
...লণ্ডনে যেতে হবে। তুই একলা থাকতে পারবি তো?'
...লাম—'খুব পারবো। ক'দিন দেরি হবে তোমার?'
...ন চার দিনের মধ্যেই ফিরব।'
...বা চলে গেলেন।
...মি বিকেলে একাই বেরিয়ে পড়লাম। কায়রো শহরের অতীত
...সে অনেক রহস্যময় কাহিনী আছে। মনে হল এই বিজ্ঞানের
...রহস্যের কোথাও কি কিছু অবশিষ্ট আছে আর? অন্যমনস্ক
...তে লাগলাম রাস্তায়। কতক্ষণ ঘুরেছিলাম জানিনা হঠাৎ
...র করলাম অনেক রাত হয়ে গেছে আর আমি একটা সরু গলির
...াড়িয়ে আছি। দেখলাম সেখানে সারি সারি অনেক দোকান
...। একটি ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে, তাঁকে প্রশ্ন করলাম—

'ওগুলো কিসের দোকান?' তিনি বললেন,—'অনেক রকম দো
আছে। দুচারটে ভাল 'কিউরিও শপ্' আছে ওখানে।' তিনি চ
যাবার পরও আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেই গলিটার দি
চেয়ে। একটা দোকানের একটা উজ্জ্বল আলো মনে হল ইশার
আমাকে যেন ডাকছে। আমার সঙ্গে টাকা ছিল। ঢুকে পড়
গলিতে এবং সোজা সেই দোকানটার সামনে গিয়েই দাঁড়াল
দেখলাম দোকানদার একজন রূপবান যুবক। মনে হল ইহু
চমৎকার ব্যবহার, ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে পারে! অনেক র
অদ্ভুত জিনিস দেখাল আমাকে। সে সবের বর্ণনা দিয়ে গল্প
ভারাক্রান্ত করব না। কিন্তু যে জিনিসটা আমার সবচেয়ে পছন্দ
তা তার দোকানে ছিল না। ছিল তার আঙুলে। চমৎকাব অ
একটি। সোনার আংটি আর কমল হীরের তৈরি অপরূপ কমল এ
বসানো তার উপর। দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। যেন ছোট্ট
জীবন্ত পদ্ম।

জিগ্যেস করলাম—'আপনার হাতের ওই আংটি নিশ্চয় ঘট
জন্য নয়—'

'আপনি নেবেন? কেউ নিতে চাইলে এ আংটি দিতেই হবে
না হলে এ আমার আঙুলে ক্রমশঃ এমন চেপে বসে যাবে যে
তখন একে খুলে ফেলতে বাধ্য হব।'

'কি রকম?'

'এ সাধারণ আংটি নয়। এর দামও অসাধারণ, একে
শর্তও অসাধারণ। এই দেখুন, আপনি চাইবামাত্র আংটি
বসেছে আমার আঙুলে, আর পদ্মটি দেখুন, যেন আরও
উঠেছে—'

সত্যিই দেখলাম পদ্মটি আরও লাল হয়ে উঠেছে। জিগ্যেস
—'এর দাম কত? আর কেনবার শর্তই বা কি?'

লোকটি স্মিতমুখে আমার দিকে চেয়ে রইল কয়েক

তারপর বলল—'এর প্রধান শর্ত হচ্ছে আবার কেউ যদি আপনার হাত থেকে আংটিটি চায় তখুনি তাকে সেটি দিয়ে দিতে হবে।'

'এর দাম?'

'সেটা বলতে সঙ্কুচিত হচ্ছি।'

'সঙ্কোচ কিসের?'

'এর দাম হচ্ছে একটি চুম্বন। আপনি আমাকে একটি চুমু খান। তাহলেই এর দাম আমি পেয়ে যাব। আমি এইভাবেই কিনেছিলাম আর একজনের কাছ থেকে —'

শুনে রাগ হল, লজ্জা হল।

বললাম—'থাক্, তাহলে আমি নেব না।'

'কিন্তু আপনি একবার যখন চেয়েছেন, এটির প্রতি একবার যখন আপনার লোভ হয়েছে, তখন আপনাকে নিতেই হবে। এ আংটি আর কারো হাতে রাখা যাবে না, ক্রমশঃ চেপে বসছে, এই দেখুন আঙুল কেমন ফুলে উঠেছে, হীরেটাও আগুনের মতো জ্বলছে। আপনাকে নিতেই হবে এটি—'

'কিন্তু ওটা খুলবেন কি করে? ও তো আঙুলে চেপে বসেছে—'

'আপনি চুমু খেলেই আবার আলগা হয়ে যাবে। উঃ, সত্যি বড় কষ্ট হচ্ছে, আর দেরি করবেন না—'

সত্যি দেখলাম ভদ্রলোকের আঙুল খুব ফুলে উঠেছে। সত্যিই কষ্ট হচ্ছে তাঁর। আর পদ্মটার প্রতি পাপড়িতে যেন আগুনের ফুলকি!

আর দ্বিমত করতে পারলাম না। যুবকটিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম। ভালই লাগল। আর কি আশ্চর্য আংটিটি সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়ে গেল। খুলে গেল তার আঙুল থেকে। আমার আঙুলে পরিয়ে দিলেন সেটি, আর সেটি আমার আঙুলে এমনভাবে ফিট্ করে গেল যেন ফরমাস দিয়ে আমি ওটি করিয়েছি।

বাড়ি ফিরে বাবার একটি 'কেবল্' পেলাম। জানিয়েছেন তাঁর ফিরতে সাতদিন দেরী হবে। আমি যেন সাবধান থাকি।

সাবধানেই ছিলাম, বাড়ি থেকে কোথাও বেরুইনি। কিন্তু চতুর্থ দিন রাতে আমার শোবার ঘরেই ঘটনাটা ঘটে গেল। গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। যে আঙুলে আংটিটা পরেছিলাম দেখলাম সে আঙুলটা টনটন করছে। তারপরই আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল ভয়ে। অন্ধকারে দেখলাম আমার মশারির পাশে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে বেড্ সুইচটা টিপতেই আলো জ্বলে উঠল। দেখলাম জোব্বা-পরা মুসলমানী টুপি পরা বিরাটকায় এক শেখ আমার আংটিটার দিকে চেয়ে আছে নির্নিমেষে। তার মুখে গোঁফদাড়ির জঙ্গল। লোলুপ চোখ দুটি ছোট ছোট, ভুরু দুটি ঝাঁকড়া, চোখের তারা সবুজ।

প্রশ্ন করলাম, 'কে তুমি—'

উর্দুতে উত্তর দিল, যার বাংলা হচ্ছে—'আমি তোমার ওই আংটিটি পেতে চাই।'

অনুভব করলাম আংটি ক্রমশ আমার আঙুলে চেপে বসেছে।

বললাম—'সত্যি চান?'

'বেশক্'।

'কিন্তু এর দাম—'

'এর দাম কি তাও আমি জানি। তোমাকে একটি চুম্বন দিতে আমার আপত্তি নেই।'

আংটি আরও ছোট হয়ে গেল, দেখলাম পদ্মের পাপড়ির আগুনের আভা। ভয় পেয়ে গেলাম। বুঝলাম আপত্তি করবার উপায় নেই।

শেখ আমাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল। মুখে পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ। আংটি নিয়ে মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল সে। ঘরের কপাট বন্ধ। কি করে ঘরে ঢুকেছিল তাও বুঝতে পারলাম না। ভূত না কি? জানি না।

এ কথাটা বাবা বা কাউকেই বলিনি। কিন্তু এখন একটু মুশকিলে পড়েছি। মাস দুই আগে আমার বিয়ে হয়েছে। ভাবছি আমার স্বামীকে জানাব কি যে বিয়ের আগে দু'জন পরপুরুষকে আমি চুম্বন

করেছিলাম? তিনি কি বিশ্বাস করবেন আমার গল্পটা? মনে হচ্ছে না বলাই ভালো। বিবেক কিন্তু দংশন করছে। সত্যি মুশকিলে পড়েছি।

ছুঁড়িটা

হাওড়া স্টেশনের সামনে রোজ দাঁড়িয়ে থাকে ছুঁড়িটা। একমাথা রুক্ষ চুল। চোখের কোণে পিঁচুটি। পরনের শাড়িটা ছেঁড়া, ময়লা। গায়ে জামা নেই। যৌবনও শেষ হয়ে গেছে। যেটুকু আছে তার জন্যেই তার পিছু নেয় এখনও অনেক লোক। হ্যাংলার মতো ঘোরে ছোঁড়া গুলো। দু' একটা বুড়োও। যারা ধনী, যারা মোটরে চড়ে' যাওয়া-আসা করে তারা ওর দিকে ফিরে চায় না। মাঝে মাঝে কেউ কেউ ভিক্ষে দেয়। তার খদ্দের গরীব 'কুলীর', পকেট-খালি ছোঁড়ারা, দু'একটা ডেলি প্যাসেঞ্জার কেরানী। কুলীদের কৃপায় সে গুড্‌স্‌ শেডের একধারে শুয়ে থাকে রাত্তিরে। আর ভোর থেকে উঠে সে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন এলেই ছুটে যায় প্ল্যাটফর্মের গেটের পাশে। গেট দিয়ে পিল্‌ পিল্‌ করে কত লোক বেরোয় তাদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। স্টেশনের টিকিট কালেকটার বাবুরা চেনেন তাকে। তারাই তার নামকরণ করেছেন 'ছুঁড়িটা'। ছুঁড়িটাকে অনুগ্রহ করেন তাঁরা। কেউ কেউ হাসি মস্করাও করেন। তার ছেলে মেয়ে নেই। 'নিরোধে'র যুগে ছেলেমেয়ে হয় না। সে তার ভাঙা যৌবনকে জোড়াতালি লাগিয়ে ফেরি করে' বেড়ায় খালি। কোনও শিশুর স্পর্শ পাবার যোগ্যতা নেই তার। অর্থনীতির কড়া আইনে সে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত। তার স্নেহ কিন্তু আঁকড়ে ধরেছে সোনাকে। সোনা একটা লোম-ওঠা খোঁড়া কুকুরের বাচ্চা। মোটরের ধাক্কায় তার একটা পা জখম হয়েছিল। ছুঁড়িটা আশ্রয় দিয়েছিল তাকে। গুড্‌স্‌ শেডের একধারে যেখানে সে শোয় সেখানে সোনাও থাকে।

রামসগিন্ কুলী একটা ছেঁড়া কাঁথা দিয়েছে তাকে। মস্থুদন দিয়েছে একটা বালিশ। খলা দিয়েছে ছেঁড়া চাদর একটা। শিবলাল দিয়েছিল ছোট একটি হাত-আয়না আর শস্তা একটা চিরুণী। এ দুটো জিনিস সে ব্যবহার করে না বড় একটা। নিজের মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় না। চুল আঁচড়েই বা কি করবে? এমনিতেই তো লোক জোটে। তার থালা বাটি কিছু নেই। আছে একটা টিনের বড় কৌটো শুধু। সে রান্না করে না। যেদিন যেমন পয়সা জোটে দোকান থেকে কিনে খায়। সোনাকেও খাওয়ায় সে। সোনাই তার জীবনের প্রধান অবলম্বন। আর প্রধান কাজ হচ্ছে প্রত্যেক ট্রেনের প্যাসেঞ্জার দেখা। গেটের পাশে সে রোজ চুপটি করে' দাঁড়িয়ে থাকে।

গুড্স্ শেডের একটা পাশ দুপুরের সময় নির্জ্জন হয়ে যায়। একটু ছাঁয়াও পড়ে। সেই ছায়াতেই মাটির উপর শুয়ে থাকে ছুঁড়িটা। গুড্স্ শেডের ভিতর ভয়ঙ্কর গরম। শুয়ে অনেক সময় ঘুমোয়। মুখে চোখের কোণে মাছি বসে বলে' মুখটা ঢেকে শোয়। যখন ঘুমোয় না, তখন দিবা-স্বপ্ন দেখে। তার সমস্ত অতীতটা মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে তার মানস-পটে।

মনে হয় তার নাম যে অপ্সরী ছিল একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে আজকাল? স্কুলে কিন্তু তার ওই নামই লেখা আছে এখনও। সে স্কুলে ভাল মেয়ে ছিল, ক্লাস সেভেন পর্য্যন্ত পড়েছিল। তারপর হঠাৎ একদিন হেডমিস্ট্রেস তার নামটা কেটে দিলেন। বললেন, তুমি বাড়ি যাও, এ স্কুলে তোমাকে পড়তে হবে না। সে বাড়ি চলে গেল, মাকে জিজ্ঞাসা করল, কেন তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিল। মা উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—কি হবে স্কুলে পড়ে, তোমার পড়ার খরচ আমি টানতে পারব না। আর পড়েই বা হবে কি? শেষকালে গতর বেচেই তো খেতে হবে।......

...তার বাবার কথা মনে পড়ে তখন। তার বাবা একদিন দিল্লী চলে গেল। বলে' গেল সেখানে নাকি ভাল একটা কাজ পেয়েছে।

দিন কতক পরে ফিরে এসে সবাইকে নিয়ে যাবে। কিন্তু বাবা আর ফেরেনি। মাকে চিঠি লিখেছিল একটা। পঞ্চাশটা টাকাও পাঠিয়েছিল মনি-অর্ডার করে। মা সে টাকা ফেরত দিয়েছিল।

...তার মা ঝি গিরি করে' বেড়াত। অনেকদিন রাত্রে ফিরত না। কোন কোন দিন মদ খেয়ে ফিরত মাতাল হয়ে।...ক্রমে ক্রমে সব বুঝতে পারল সে। বুঝতে পারল মা বেশ্যাবৃত্তি করে। পাড়ার একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক একদিন তাকে বললেন, তোর বাবা তোর মাকে বিয়ে করেনি, 'রাখনি' রেখেছিল। দিল্লীতে তার বউ ছেলে সব আছে। সে এখন মস্ত লোক। তুই যদি আমার বাড়িতে কাজ করিস তোকে মাসে একশ' টাকা করে দেব। আমার বৌ মরে গেছে। আমার ঘরে একেশ্বরী হয়ে থাক তুই। তোর কোন অভাব রাখব না।

সে তখন প্রত্যাখ্যান করেছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। পারা যায় না। একদিকে অভাব আর একদিকে প্রলোভন। না, নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি সে। তারপর...তারপর সব কেমন যেন আবছা হয়ে যায়, মনে পড়ে একটি পশুত্বের হুল্লোড়ের মধ্যে দিনগুলো কেটে গেছে খালি। মাঝে মাঝে ভালো যে লাগেনি তা নয়, কিন্তু সবসময় ভালো লাগত না। ভাল না লাগলেও ভাল লাগার ভান করতে হত। তার কাছে একজন কবি আসতেন, মদ খেয়ে বড় বড় কবিতা আওড়াতেন। কি জঘন্য পশু ছিল লোকটা! একটা কুটেও আসত তার কাছে। বড় লোক, কিন্তু কুটে! অনেক টাকা দিত। মদ খেয়ে হাউ হাউ করে' কাঁদত। কতরকম লোকই যে আসত। একদিন কিন্তু ওপাড়া ছাড়তে হ'ল, তার মাকে কে খুন করে' গেল একদিন। সে সেদিন বাড়ি ছিল না, এক বাবুর বাগান বাড়িতে গিয়েছিল। সকালে ফিরে এসে দেখে তার মায়ের গলাটা কাটা। বুকের মাঝখানেও একটা ছুরি বসানো।

সেই দিনই পালিয়ে যায় সে সেখান থেকে। পালিয়েও নিস্তার

পায়নি। পুলিশের কবলে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। তার যা কিছু সম্বল ছিল ওই পুলিশের গর্ভেই গিয়েছে। কেউ তাকে বাঁচায় নি, সবাই তাকে লুট করবার চেষ্টা করেছে। সবাই মিলে তাকে চুষে, চিবিয়ে, ছিবড়ের মতো ফেলে দিয়েছে রাস্তায়। এখন তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। যারা তাকায় তারাও ছিবড়ে। দেশ? আমাদের দেশ নাকি অনেক ভালো, কিন্তু কই সে তো কোন প্রমাণ পায়নি। একটাও ভালো লোক দেখতে পায়নি সে। সত্যি কি ভালো লোক নেই তাহলে? সবাই কি লোলুপ পশু?

গুড্‌স্ শেডিংয়ের পাশের জায়গাটায় দুপুর বেলা শুয়ে শুয়ে মুখে ময়লা কাপড় চাপা দিয়ে এইসব কথাই রোজ ভাবে ছুঁড়িটা। তার মনে কিন্তু একটা আশা এখনও আছে। তার মনে হয় তার বাবা একদিন ফিরে আসবে। কেন একথা মনে হয় তা সে জানে না, কিন্তু মনে হয় তার বাবা নিশ্চয় আসবে একদিন। তাই সে হাওড়া প্ল্যাটফর্মে ঘুরে বেড়ায়। ট্রেন এলেই গেটের সামনে দাঁড়ায়, প্রত্যেকটি প্যাসেঞ্জারকে নিরীক্ষণ করে দেখে। কিন্তু বাবার দেখা পায়নি আজও। বাবার ঠিকানাও জানে না, জানলে চিঠি লিখত। তবু সে আশা করে, বাবা একদিন আসবেই। প্রতিটি ট্রেনের প্যাসেঞ্জারের ভীড়ের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকে বাবা ওদের মধ্যে আছে কিনা। না, নেই—রোজই হতাশ হ'তে হয় তাকে।

যদিও দুপুরে শুয়েছিল সে মুখ ঢেকে, হঠাৎ একটা কাগজ উড়তে উড়তে এসে তার মুখের উপর পড়ল। ছাপা হ্যাণ্ডবিল একটা। কাগজটা পড়েই উঠে বসল সে তড়াক করে। কাগজে বড় বড় অক্ষরে তার বাবার নাম ছাপা। তিনি নাকি আগামীকাল এসে মহাজাতি সদনে একটা বক্তৃতা দেবেন। তার বাবা বক্তৃতা দেবেন? কিসের বক্তৃতা?

পরের দিন সে সকালে উঠে দেখল স্টেশনে বেশ ভীড় হয়েছে। অনেকের হাতে মালা। টিকিট কালেক্টারকে জিজ্ঞাসা করে' জানতে পারল হ্যাণ্ডবিলে যার নাম ছাপা তাকেই অভ্যর্থনা করবার জন্যে এসেছেন এঁরা। তার বাবাকে? কি আশ্চর্য!

ট্রেন এলো। গেটের বাইরে উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। দেখল অনেক লোকের সঙ্গে তার বাবাই তো আসছেন। গলায় ফুলের মালা। মাথার চুল পেকে গেছে। কিন্তু গালের কালো জড়ুলটা তো ঠিক আছে। হ্যাঁ, তার বাবাই তো। 'বাবা' বলে চিৎকার করে উঠল সে।

'সরো সরো সরো এখান থেকে—'

একদল লোক এসে তাকে সরিয়ে দিল। তবু ভীড়ের পিছু পিছু গেল সে। দেখল তার বাবা প্রকাণ্ড একটা মোটরে চড়ে চলে গেল। তার দিকে ফিরেও চাইল না।

তারপর দিন মহাজাতি সদনে গিয়েছিল সে। লোকে লোকারণ্য। দেখল তার বাবা গলায় মালা পরে বসে আছেন মঞ্চের উপর। একজন এগিয়ে এসে বললেন—'এঁর পরিচয় আপনারা সবাই জানেন। দেশের এ দুর্দ্দিনে এঁর অমূল্য উপদেশ আমাদের পথ নির্দ্দেশ করবে।—' বাবা-বাবা-বাবা—তারস্বরে চীৎকার করে সে মঞ্চের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু পারল না। পুলিশের লোক টেনে বার করে দিল তাকে। পুলিশের ব্যাটনের আঘাতে অজ্ঞানও হয়ে গেল সে।

পরদিন কাগজে তার বাবার বক্তৃতা ছাপা হল। তিনি বলেছেন —আমাদের সকলকে চরিত্রবান হতে হবে, চরিত্রই আমাদের মূলধন।

ব্যবধান

দশ বছরের টুটুল এসে মাকে বললে—'মা বাইরের ঘরে কে একটা দাড়ি-ওলা বুড়ো এসে বসে আছে। বলছে বাবার সঙ্গে দেখা করবে। আমি বললাম বাবা নেই বাড়িতে, তবু বসে আছে। বলছে তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করব।'

টুটুলের মা সুমিত্রা রাজি হল না।

বলল—'আমি কারো সঙ্গে দেখা করব না। বলে দে বাবা ট্যুরে বেরিয়েছেন, আজ ফিরবেন না। মা আপনার সঙ্গে দেখা করবে না।'

সুমিত্রার মনে হল নিশ্চয় কোন সাহায্যপ্রার্থী। কালই একজন কন্যাদায়গ্রস্ত বুড়ো এসেছিল দুটো টাকা না নিয়ে উঠল না। দেখা করলেই বিপদ।

টুটুল বেরিয়ে এসে বললো—'বাবা ট্যুরে গেছেন, আজ ফিরবেন না। মা দেখা করবেন না আপনার সঙ্গে।' টুটুল জানে বাবা ট্যুরে গেছে এটি মিথ্যা কথা। তবু মায়ের প্ররোচনায় সে মিথ্যা কথাটি বলল গিয়ে।

বৃদ্ধ বললেন, 'ও তাই নাকি। আচ্ছা আমি যাচ্ছি তাহলে। তুমি কোন ক্লাসে পড়?'

'ক্লাস ফোরে।'

'তোমার দাদা?'

'দাদা পড়া ছেড়ে দিয়েছে। তরুণ দলের সেক্রেটারি হয়েছে আজকাল।'

'তরুণ দলের সেক্রেটারি? তরুণ দলে কি হয়?'

'ক্রিকেট খেলা হয়, মাঝে মাঝে গান বাজনার জলসা হয়,

থিয়েটার হয় পুজোর সময়। চমৎকার থিয়েটার করে দাদারা। গতবারে আলিবাবাতে দাদা আবদালা সেজেছিল। কি দারুণ জমিয়েছিল যে—'

'তাই না কি। তোমার দিদি কি করে?'

'দিদিকে আপনি চেনেন না কি?'

'ঠিক চিনি না। তবে তোমার যে দিদি আছে তা জানি। তাই জিগ্যেস করছি—'

'দিদি আজকাল ভি আই পি!'

'ভি আই পি? তার মানে?'

'দিদি আজকাল এক মিনিস্টারের মেয়েকে গান শেখায়। দিদিকে নিতে প্রকাণ্ড গাড়ি আসে রোজ।'

'তাই না কি—'

'দিদির জন্যেই বাবার চাকরিতে উন্নতি হয়েছে। আজকাল বাবা যে পোস্টে বদলি হয়েছেন তাতে খুব উপরি—'

'টুটুল শোন—'

ভিতর থেকে সুমিত্রার কঠিন কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

টুটুল ভিতরে যেতেই ধমক দিয়ে তাকে বললেন—'কি সব বকবক করছিস বাইরের লোকের কাছে। বাক্যবাগীশ কোথাকার। ওপর থেকে তোর দাদাকে ডেকে দে।'

টুটুল দাদাকে ডাকতে তিন তলায় চলে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড একটি মোটর এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। তার থেকে নামল একটি চটুলা তন্বী। মাথার পিছন থেকে লম্বা বেণী ঝুলছে। পরনে পিটকাটা ঘাড়কাটা ব্লাউস, কাপড় এমন টাইট করে পরা সর্বাঙ্গ দেখা যাচ্ছে। চোখে কাজল। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ঘরে এসে ঢুকল। বৃদ্ধের দিকে এক নজর চেয়ে দেখল কিন্তু তার পরিচয় নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। হাতে চাবি-বাঁধা রঙীন রুমালটা ঘোরাতে ঘোরাতে

ভিতরের দিকে ঢুকল। তার আবদার-মাখা উচ্চ কণ্ঠস্বর বৃদ্ধ বাইরে থেকে শুনতে পেলেন।

'মা ওমা, কোথা তুমি। আমাকে এখুনি গভর্নরের বাড়ি যেতে হবে পার্টিতে। সেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হবে আমাকে। আমি শাড়িটা বদলাতে এলাম। এটা 'ক্রাশড্' হয়ে গেছে—।'

বৃদ্ধ জানলা দিয়ে দেখলেন একটি খালি গ্যারাজ রয়েছে। নিশ্চয় মোটরও আছে এদের। মনে হল—কিন্তু—। চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল তাঁর। ঘরে প্রবেশ করল কালো চোং-প্যান্ট পরা একটি ছোকরা। গায়ে একটি হাফশার্ট রয়েছে। মনে হল জামাটা রোঁয়া-ওলা তোয়ালে থেকে তৈরি। মাথায় লম্বা চুল, গালে চওড়া জুলফি, গোঁফ আর দাড়ির সমন্বয়ে মুখের চারদিকে থুতনী পর্যন্ত চুলের একটা আবেষ্টনী। পায়ে চপ্পল। চোখে গগলস্।

'আপনি কাকে চান?'

'আমি সুরথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'বাবা এখন বাড়িতে নেই।'

'আমি যদি অপেক্ষা করি?'

'না আপনি এখন কেটে পড়ুন।'

'ও আচ্ছা—'

উঠে পড়লেন ভদ্রলোক এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

ঘণ্টা তিনেক পরে এলেন আবার ভদ্রলোক। দেখলেন কপাট বন্ধ। ইলেকট্রিক বেলের সুইচটা টিপলেন। টুটুল আবার বেরিয়ে এল।

'আপনি আবার এসেছেন?'

'এই চিঠিখানা দিতে এলাম। তোমার বাবা ফিরেছেন?'

'না—'

'এলে এই চিঠিখানা দিও তাঁকে।'

একটি খামে মোড়া চিঠি দিয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

ঈষৎ মত্ত অবস্থায় রাত্রি দশটা নাগাদ ফিরলেন সুরথবাবু। স্বামীকে মত্ত অবস্থায় দেখে কিছু বললেন না সুমিত্রা। প্রথম প্রথম বলতেন এখন আর বলেন না। মদ খাওয়াটা চা খাওয়ার মতোই এখন দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ এই সত্যটা মেনে নিয়েছেন তিনি।

সুরথবাবু এসেই প্রশ্ন করলেন—'কোন ফোন এসেছিল?'

'এসেছিল। তোমার স্টেনো মিস মাইতিকে তুমি সন্ধ্যেবেলা আসতে বলেছিলে?'

'বলেছিলাম।'

'আমি মানা করে দিয়েছি। তোমার আপিসেব কাজ তুমি আপিসে কোরো। বাড়িতে স্টেনো-ফেনো আনা চলবে না।'

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে একটু ঝাঁজ লক্ষ্য কবে হাত উলটে সুরথবাবু বললেন—'বেশ, রাত বাবোটা পর্যন্ত আপিসেই থাকবো তাহলে। চিঠিপত্র এসেছিল?'

'অনেকগুলো বিল এসেছে। মদের বিল এমাসে তিনশ টাকা।'

সুরথবাবু মুখটা সুচালো করলেন একটু!

'ও হ্যাঁ। আব এক বুড়ো তোমার সঙ্গে দেখা কববে বলে এসেছিল। দেখা না পেয়ে শেষে টুটুলের কাছে একটা চিঠি রেখে গেছে। কোনও প্রার্থী বোধহয়।'

সুমিত্রা চিঠি খানা দিয়ে উপরে চলে গেলেন!

সুরথবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে খুললেন চিঠিখানা।

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং

পরমকল্যাণবরেষু

সুরথ, কুড়ি বছর পরে কন্‌থল্ থেকে হঠাৎ এসে পড়েছিলাম। তোমাকে খবর দেওয়ার সময় ছিল না। এসে দেখলাম কেউ আমাকে চিনতে পারছে না। তোমাদের কাছে আমার যে ফোটোটা আছে সেটা আমার যৌবনের। এখন আমি পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ। তাছাড়া

গোঁফ দাড়ি রেখেছি আজকাল। চেহারা তো বদলেই গেছে, গলার স্বরও বদলেছে সম্ভবত। আমাকে চিনতে না পারাটাই স্বাভাবিক। পেনসন নেবার পরই যখন তোমার চাকরি হল তখনই আমি সংসার ত্যাগ করে কনখলে চলে গিয়েছিলাম। তখন থেকেই আমি কনখলে আছি। তোমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার পরিচয়ও নেই তেমন। কিন্তু আজ একনজর দেখেই বুঝলাম যে ছেলেমেয়েগুলি কেমন যেন অসভ্য হয়ে গেছে। ভদ্রবাড়ির ছেলেমেয়েদের মুখে যে ভদ্র নম্র ভাব থাকে, তা যেন ওদের মুখে নেই। তোমার বাড়িঘর আসবাবপত্র ড্রয়িং রুমের সোফা সেট তোমাব মোটরের গ্যারেজ দেখে মনে হল যে মাসে তোমার অন্তত দুই হাজার টাকা খরচ। কিন্তু তোমার মাইনে তো শুনেছি পাঁচশ টাকা। অসদুপায়ে উপার্জন করছ না কি? আমি সংসারের হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়তে চাই না বলেই তোমাদের কোনও খবর নিই নি। একা একা কনখলে সুখেই আছি। হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস কচ্ছি। আর প্রতি বছর লটারির টিকিট কিনি। এ বছর বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে গেল। দেড় লাখ টাকা পেয়ে গেছি। টেলিগ্রাম পেয়ে সেইটে নিতেই এসেছিলাম। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে অত টাকা নিয়ে আর কি করব? ভেবেছিলাম তোমাদেরই দিয়ে যাব টাকাটা। কিন্তু তোমাদের হাব-ভাব চাল-চলন একটুও ভালো লাগল না। তাই ঠিক করেছি টাকাটা কোনও সৎ প্রতিষ্ঠানেই দান করে যাব আমার মা-বাবার স্মৃতিরক্ষার জন্য। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি তোমাদের সুমতি দিন। আমাদের দেশের আদর্শকে মলিন করবার চেষ্টা করলে তোমরা নিজেরাই মলিন হবে। আদর্শ ঠিক থাকবে। এই কথাটি মনে রেখো। আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। ইতি

শ্রীদশরথ গঙ্গোপাধ্যায়

বাবার চিঠির দিকে বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইলেন সুরথবাবু। সহসা একটা ছবি ভেসে এল তাঁর মনে—খুব ছেলেবেলায় বাবা তাঁকে কোলে করে পাঠশালায় পৌঁছে দিয়ে আসতেন।

মনের এ ভাব কিন্তু পরক্ষণেই কেটে গেল। সহসা তাঁর মনে হল —'এতগুলো টাকা বেহাত হয়ে যাবে? কিছুতেই না। খুঁজে বার করতেই হবে তাঁকে।'

টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

নাচ জমলো শেষে

আমার বন্ধু যোগেন ছুটতে ছুটতে এসে আমার বাড়িতে ঢুকল। ঢুকেই দড়াম করে কপাটটা বন্ধ করে খিল এঁটে দিল। দেখলাম তার চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, চুলগুলো উসকো খুসকো। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত।

'যোগেন? এ সময় হঠাৎ যে। খিল বন্ধ করলি কেন?'

যোগেন খানিকক্ষণ চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর ফিসফিস করে বলল—'তাড়া করেছে—'

'তাড়া করেছে? কে?'

—'কে আবার, সেই হারামজাদী, এখন সোহাগ জানাতে এসেছে।'

'—কার কথা বলছিস্, বুঝতে পারছি না ঠিক—'

—'ছুলারী, ছুলারী! সেই চণ্ডি বেশ্যা ছুঁড়ি।'

—'কি রকম? সে তো শুনেছিলাম কোন নবাবের দরবারে বাহাল হয়েছিল—'

'—হবে না? নবাবের যে বেশী টাকা। আমি ওকে মানুষ করলাম নাচগান শেখালাম, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করলাম—যেই পাখা গজালো ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। এখন ঢং করতে এসেছে।'

—'হা হা হা' হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে হেসে উঠলো যোগেন। আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। যোগেন আমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল।

—'মেয়েটা জিপসির মেয়ে ছিল। জানতে তুমি?'

—'তুমিই তো বলেছিলে একদিন'

—'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। ওর বাবা ভানুমতীর খেলা দেখাত—রাস্তা থেকেই কিনেছিলাম মেয়েটাকে। এখন ওই আমাকে ভানুমতীর খেলা দেখাচ্ছে। ম্যাজিক। আশ্চর্য ম্যাজিক—'

—'ম্যাজিক?—'

—'হ্যাঁ ম্যাজিক। আশ্চর্য ম্যাজিক—হারামজাদী।'

দাঁত কড়মড় করে থেমে গেল যোগেন।

—'ব্যাপারটা খুলেই বল না—'

—'খুলে বললে কি বিশ্বাস করবে? করবে না।'

প্রায় আর্তনাদ করে উঠল যোগেন।

—'আবে বলই না শুনি, কপাটটা বন্ধ করে দিলে কেন?'

—'ছুঁড়ি আমার পিছু পিছু ঘুরছে। ওই চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছে। আদর করে ওর নাম দিয়েছিলাম কিন্নরী। এখন কিন্নরী ভয়ঙ্করী হয়ে দাঁড়িয়েছে—'

—'রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছে? কই দেখি—'

কপাটটা খুলতে গেলাম। যোগেন ব্যাকুলভাবে ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরল।

'খুলো না, খুলো না। তুমি কিছু দেখতে পাবে না। আমিই খালি দেখতে পাবো। কপাট খুললে এখনই হয়তো এখানে এসে ঢুকবে। হয়তো না খুললেও ঢুকে পড়বে। সব পারে ওরা। ভানু-মতীর ম্যাজিক জানে তো। তোমার রিভলবারটা কোথা?'

—'তোমার পেছনেই সেলফে রয়েছে—'

যোগেন রিভালবারটা নিয়ে ডান হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরল।

—'লোডেড আছে তো?'

—'আছে। রিভলবার নিয়ে কি করবে?'

—'যদি ঘরে ঢোকে তো গুলি করব। ওর ম্যাজিককে গুলি করব—'

—'আরে ব্যাপারটা কি হয়েছে বলই না খুলে।'

গুম হয়ে রইল যোগেন খানিকক্ষণ।

—তারপর বলল,—'বিশ্বাস করবে? আমাকে পাগল ভাববে না তো?'

—'আরে তুমি বলই না আগে।'

—'তবে শোন। নবাবের দরবারে যদিও চলে গিয়েছিল তবু কিন্নরীর সঙ্গে চিঠির আদান প্রদান ছিল। একদিন হঠাৎ চিঠি পেলাম 'আপনি যদি আপনার গিবিডিব বাড়ীতে যান, নাচ দেখিয়ে আসব আপনাকে। রবিবার ছুটি নিয়েছি সন্ধ্যেবেলা আপনাব বাড়িতে যাব। নাচ দেখাব। ভোরে ফিরে আসব আবার।' আজ তো মঙ্গলবাব, রবিবার গিরিডির বাড়িতে ছিলাম সন্ধ্যা থেকে। অপেক্ষা করেছিলাম তাব জন্যে। রাত বারটা বেজে গেল তবু এল না। জ্যোৎস্না রাত ছিল। বাড়ির সামনের মাঠটা ভরে গিয়েছিল জ্যোৎস্নায়। সে-ও যেন অপেক্ষা করছিল তার। মনে হচ্ছিল ওটা যেন মাঠ নয়, আমারই মন। হঠাৎ দূরে শেয়াল ডেকে উঠল।' ঘড়িতে দেখলাম একটা বেজে গেছে। ভাবলাম এবার শুয়ে পড়ি আলো নিভিয়ে। তারপরই ঘটনাটা ঘটল। শুরু হল কিন্নরীর ম্যাজিক। দেখলাম দরজা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কি একটা ঢুকছে। দেখি একটা পা, উরুত শুদ্ধ পা। পা-টা ঘরে ঢুকেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর আমাকে ঘিরে ঘিরে নাচতে লাগলো।'

—'নাচতে লাগল?'

—'হ্যাঁ নাচতে লাগল। সে কি ভীষণ নাচ। তাণ্ডব নৃত্য। ধপাধপ ধপাধপ নেচেই চলেছে। তখন বুঝতে পারলাম হারামজাদী

ম্যাজিক করছে। ওরা গুণ করতে পারে, বাণ মারতে পারে। কুশ-পুত্তলিকা পুড়িয়ে মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। হিপনোটাইজ করে যা খুশি করতে পারে। জিপসির মেয়ে তো। নিজে না এসে পা পাঠিয়ে দিয়েছে। আর কি সে পা। একটা ছোট কলাগাছের গুঁড়ি যেন। কবিরা যাকে বলেছেন রম্ভোরু, ঠিক তাই। একটা রম্ভোরু আমাকে ঘিরে লম্ফ ঝম্ফ করতে লাগল। চীৎকার করে উঠলাম—দূর হ হারামজাদী। সঙ্গে সঙ্গে সোঁ করে বেরিয়ে গেল কপাট দিয়ে। রাগে আমার সর্বাংগ রিরি করছিল। আমিও বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে। হেঁটে স্টেশনে এলাম, তারপর ট্রেণ আসতেই চলে এলাম কলকাতায়। হাওড়ায় এসে দেখি প্যাসেঞ্জারের ভিড়ের মধ্যে সে রয়েছে। কিন্নরী। কাটা পা-টা কাঁধের উপর। আর একটা পা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। তারপর থেকে আমার সঙ্গ ছাড়েনি। যেখানে যাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে চলছে। এক পা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আর কাঁধের উপর সেই কাটা পা-টা। বিরিঞ্চির বাড়ি গিয়েছিলাম। সে বাড়িতে নেই। তাই তোমার কাছে চলে এলাম। হারামজাদী ওই মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেরুলেই সঙ্গ নেবে। অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে না, কেবল আমিই পাচ্ছি। আশ্চর্য ম্যাজিক জানে মেয়েটা—'

'এটাকে ম্যাজিক, বলছ?'

হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাজিক, ম্যাজিক। জিপ্‌সি মেয়েরা অনেক রকম ম্যাজিক জানে।'

এমন সময় বাইরে থেকে কপাটে ধাক্‌কা পড়ল।

'কে—'

'আমি বিরিঞ্চি। যোগেন এখানে এসেছে?'

—কপাট খুলে দিতেই বিরিঞ্চি এসে ঢুকল। সে-ও আমাদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

বিরিঞ্চি যোগেনের দিকে ফিরে বলল 'খবরটা শুনেছ? তোমার কিন্নরী রেলে কাটা পড়েছে।'

যোগেন বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে—'বাজে কথা। কিন্নরী মরতে পারে না।—'She is immortal'.

'আরে আমি নিজের চোখে দেখলুম। ট্রেণ ছেড়ে দিয়েছিল। মেয়েটা চলন্ত ট্রেণে চড়তে গিয়ে পড়ে গেল ট্রেণের নীচে। উরুত শুদ্ধ পা-টা কেটে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

দেখা গেল তার ব্যাগে কিছু টাকা, নাচবার ঘুঙুর, আর গিরিডির একটা টিকিট রয়েছে—'

—'বিশ্বাস করলাম না। তুমি মিথ্যে কথা বলছ।'

'আরে স্বচক্ষে দেখলাম—'

—'তুমি মিথ্যুক! তুমি মিথ্যুক! তুমি মিথ্যুক! কিন্নরী মরে নি, মরতে পারে না।'

—'আমি বলছি—'

—'শাট আপ—'

'বিশ্বাস কর!'

এরপর যোগেন যা করলে তা অবিশ্বাস্য। রিভলবারটা তুলে বিরিঞ্চির বুকে গুলি চালিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল বিরিঞ্চি। আমি যোগেনকে ধরতে যেতেই আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল সে। আমিও পড়ে গেলাম। তারপর সে নিজেও বোধহয় আত্মহত্যা করেছিল।

কারণ একটু পরেই দেখলাম সম্ভবত পরলোকে আমরা তিনজন একটা নাচের আসরে বসে আছি। সামনে কিন্নরী নাচচে।'

বাস্তব-অবাস্তব

উদীয়মান একজন আধুনিক লেখক একটি অদ্ভুত দিবাস্বপ্ন দেখলেন একদিন। উপন্যাস লিখে খুব নাম করেছেন তিনি। যদিও খুব বাস্তবধর্মী লেখক, কিন্তু স্বপ্নটি দেখলেন অদ্ভুত ও অবাস্তব। খোলা জানলা দিয়ে একটি পরী ডানা মেলে এসে প্রবেশ করল তাঁর ঘরে। বলল—'মহাকালের দরবারে আপনার ডাক পড়েছে। যদি যেতে চান এখনই চলে যান।'

লেখক সবিস্ময়ে উত্তর দিলেন—'মহাকালের দরবার? সে আবার কোথা?'

পরীর হাতে একটি চমৎকার মালা ছিল।

বললে—'এই মালাটি আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। এটি গলায় পরবামাত্র মহাকালের দরবারে গিয়ে উপনীত হবেন আপনি।'

মালাটি টেবিলের উপর রেখে পরী জানলা দিয়ে উড়ে চলে গেল। লেখক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন মালাটি ক্রমশঃ ছোট হয়ে যাচ্ছে। একটু পরে হয়তো একেবারে লোপ পেয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি মালাটি পরে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে যা হল তা আরও বিস্ময়কর। সমস্ত পরিবেশটাই বদলে গেল। লেখকের ছোট ঘরটা লুপ্ত হয়ে গেল যেন। মনে হল তিনি যেন মহাশূন্যে বসে আছেন। ডানদিকে দূরে মণিমাণিক্যখচিত একটা বইয়ের শেলফ্ রয়েছে। তাতে রাখা আছে রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, অডিসি, প্যারাডাইস লস্ট এবং আরও অনেক বই—সব নাম পড়া গেল না। বাঁদিকে দূরে জ্বলছে একটি অগ্নিকুণ্ড। লক্ লক্ করে শিখা বেরুচ্ছে তার ভিতর থেকে। আর ঘরের মাঝখানে তারই একটি জনপ্রিয় বই নিরালম্ব হয়ে ঝুলছে। ঘরে কোনও লোক নেই। এই বইটিরই দশম সংস্করণ বাজারে চলছে।

হঠাৎ শূন্য থেকে একটা প্রশ্ন ভেসে এল।

'আপনার এই বইয়ে যৌন ব্যাপার নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করেছেন কেন?'

'কে আপনি?'

'আমি মহাকালের দূত। তাঁর আদেশেই আমি আপনার কাছে এসেছি।'

লেখক কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে শেষে বললেন 'আমি গোটা মানুষটাকে দেখাতে চাই। তাই কিছু গোপন করিনি—'

'আপনি তো বিজ্ঞানী নন, আপনি রসস্রষ্টা। তাছাড়া গোটা মানুষটাকেও তো আপনি দেখান নি। মানুষের ঘাম হয়, ঘামের কেমন গন্ধ, ঘামে কি কি উপকরণ আছে, প্রভাতে সন্ধ্যায় শৌচকর্ম করবার সময় প্রত্যেক নরনারী যা যা করে এ সবের বর্ণনাও তো আপনার পুস্তকে নেই। কেবল ওই যৌন ব্যাপারটা নিয়েই আপনি মাতামাতি করেছেন কেবল। প্রত্যেক মানুষের একটা অদৃশ্য রহস্যময় দিক থাকে সে সম্বন্ধেও আপনি নীরব। আপনি গোটা মানুষ তো দেখাতে পারেন নি। আপনার প্রবণতা কেবল যৌন ব্যাপারের দিকে আর অভব্যতার দিকে, এর কারণ কি?'

লেখক চটে গেলেন।

বললেন—'আমার যা খুশী লিখেছি। তাতে আপনার কি?'

'যা খুশী লিখলে সাহিত্য হয় না।'

যে বইটি শূন্যে ঝুলছিল কোন অদৃশ্য হস্ত সেটি নিয়ে সহসা অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করল। দেখতে দেখতে ভস্মীভূত হয়ে গেল বইটি।

পরমুহূর্তে ঝনঝন করে ফোন বেজে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেল লেখকের। ঘড়িতে দেখলেন তিনটে বেজেছে। প্রকাশক ফোন করছেন। বললেন—'আপনার বইটির দশম সংস্করণও নিঃশেষ হয়ে গেল। আমরা আরও তুহাজার ছাপতে চাই—'

লেখক উঠে একটা জামা গায়ে দিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

প্রকাশকের বাড়ি যেতে হবে। নীচে নেমে একটা ট্যাকসি ধরলেন। ট্যাকসিতে চড়ে সিগারেট ধরালেন একটা। ভাবলেন—কি বাজে স্বপ্ন দেখলাম একটা। মহাকালের দরবার—হ্যাঃ—' ট্যাকসি হু-হু করে প্রকাশকের দোকানের দিকে ছুটতে লাগল।

নায়ক—১৯২২

বিষয়টি চমৎকার। এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা যায়। কবিতা লেখা যায়, নাটকও লেখা যায়। আমি আমার বক্তব্য গল্পে বললাম।

আমরা কবে থেকে প্রেমে পড়তে শুরু করেছি এর নির্ভুল তারিখ আজ পর্যন্ত কেউ নির্ণয় করতে পারেননি। প্রেমে পড়া ব্যাপারটার সঙ্গে নানারকম উপমাও দিয়েছেন নানা জাতের লেখক যুগে যুগে। কেউ বলেছেন ওটা যেন নায়াগ্রা প্রপাত সাঁতরে যাওয়ার মতো, কেউ বলেছেন দুরারোহ পর্বত-উল্লঙ্ঘন, কারো মতে জটিল অরণ্যে পথ-হারিয়ে ফেলা, কেউ আবার ওর উপমা দিয়েছেন অগ্নি-পরীক্ষার সঙ্গে। সবগুলোই সত্য। কিন্তু হাল আমলের—মোটে পঞ্চাশ বছর আগেকার ছোকরা—বিষ্ণু ভট্টাচার্যের মনে হতে লাগল যেন একটা তপ্ত-লৌহশলাকা তার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। শলাকাটির রূপক-বিবর্জিত রূপ—মেয়েটি অব্রাহ্মণ। সুশীলা অপরূপ সুন্দরী, বয়স ষোলো, পাশের বাড়িতে থাকে, চোখাচোখি হলে চোখ নামিয়ে নেয়, গাল লাল হয়ে ওঠে, তার বাবার সঙ্গে বিষ্ণুর বাবার বন্ধুত্বও খুব, তার হাসি, গান সবই শুনতে পায় বিষ্ণুচরণ, কিন্তু হায় সে কায়স্থের মেয়ে। অত্যন্ত মনোরমা, অত্যন্ত ভালো, কিন্তু নাগালের বাইরে। বিজ্ঞানের ছাত্র বিষ্ণুচরণ কবিতা লিখতে লাগল। বিখ্যাত কাগজগুলো তার কবিতাকে তেমন আমোল দিল না যদিও, কিন্তু মফঃস্বল থেকে

প্রকাশিত একটি কাগজে ছাপা হতে লাগল তার প্রণয়োচ্ছ্বাস। আর সে কাগজটি যাতে সুশীলার কাছে যায় সে ব্যবস্থাও ক'রে ফেলল বিষ্ণুচরণ। পাশাপাশি বাড়ি, দোতলার জানালায় দেখা হল একদিন সুশীলার সঙ্গে।

"সুশী, 'অর্ঘ্য' কাগজটা পেয়েছ ?"

"পেয়েছি—"

সলজ্জ হাসি হেসে চলে গেল সুশীলা।

সুশীলা সে যুগের হিসাবে শিক্ষিতা মেয়ে। মাইনর পরীক্ষা পাশ। 'অর্ঘ্য' পত্রিকায় মুদ্রিত 'খঞ্জ-ছন্দের কবিতাগুলি যে তারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'অর্ঘ্য' একথা বুঝতে দেরী হয়নি তার। কিন্তু এরপর থেকেই বিষ্ণুচরণকে এড়িয়ে চলত সে। জানালার সামনে আর দেখা যেত না তাকে। কিন্তু খঞ্জ-ছন্দের হলেও কবিতাগুলি তার মনে সাড়া জাগিয়েছিল বইকি। দুরু দুরু অন্তরে একাধিকবার সে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়েছিল কবিতাগুলি। 'হৃদয়খানি তোমার পায়ে ওগো দেবি করছি সমর্পণ, ওগো নিঠুর দয়া করে কর তা গ্রহণ'—এই লাইনটি খুবই ভালো লেগেছিল তার। গ্রহণও হয়তো করেছিল, কিন্তু মনে মনে। বাইরে কিছু তো করবার উপায় নেই। ও কথা ভাবাও যে অন্যায়। বিষ্ণুদা ব্রাহ্মণ, আর সে কায়স্থ। পারতপক্ষে তাই সে আর বিষ্ণুচরণের মুখোমুখি হত না। 'অর্ঘ্য' পত্রিকাটিও প্রকাশিত হত না নিয়মিত। তাই বিষ্ণুর কবিতাগুলিও আর নিয়মিত পৌঁছত না তার কাছে। বিষ্ণু ভাবল চিঠি লিখবে। গোলাপী রঙের ভালো চিঠির কাগজ আর খামও কিনে আনল। নতুন 'ব্ল্যাক বার্ড' কলমও কিনে ফেলল একটা। কিন্তু চিঠি লিখতে গিয়ে হঠাৎ তার মনে হল—এ চিঠি যদি আর কারো হাতে পড়ে। তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। কলঙ্কিনী বলবে সবাই সুশীলাকে। না, না, চিঠি লেখা চলবে না। বিবেকে বাধতে লাগল বিষ্ণুচরণের। চিঠি লেখা হল না। কি করবে ভাবছে এমন সময় তার মা একদিন তাকে বললেন, "বিষ্ণু তুইও মেয়ে দেখবি না কি ?"

"কোন মেয়ে—"

"তোর বাবা পটলডাঙার বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের মেয়েকে পছন্দ করে এসেছেন। মেয়েটি নাকি অপরূপ সুন্দরী। দেবে থোবেও ভালো—"

বিষ্ণুচরণ নির্বাক হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল—"আমি যদি অপছন্দ করি বিয়ে ভেঙ্গে দেবে তোমরা?"

"অপছন্দ করবি কেন? তোর বাবার মতো খুঁতখুঁতে লোক যখন পছন্দ করেছেন, তখন তোরও পছন্দ হবে। চমৎকার মেয়ে। দেখতে চাস তো ব্যবস্থা করি—"

"দেখতে গেলে আমি অপছন্দ করে আসব। আমার পছন্দ-অপছন্দের যদি তোমরা মূল্য দাও তাহলে তোমরা ওর মধ্যে মাথা গলিও না"

"কেন, তুই নতুন আর কি করবি"

"ধর যদি অন্য জাতের মেয়েকে বিয়ে করতে চাই"

"পাগল হয়ে গেলি না কি তুই! আমরা ব্রাহ্ম, না খৃষ্টান? অন্য জাতের মেয়ে বিয়ে করবি কিরে? তুই কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করবি। ক্ষ্যাপা কোথাকার। লেখাপড়া শিখে এই বুদ্ধি হয়েছে তোর"

বিষ্ণুচরণ আর কিছু বলতে সাহস করেনি। কেবল বলেছিল—"তবে তোমাদের যা খুশি কর"

বাড়ুজ্যে মশাইয়ের মেয়ে সুরেশ্বরীকেই বিয়ে করতে হয়েছিল শেষকালে। সুরেশ্বরীর মতই নেয়নি কেউ বিয়ের আগে। সুরেশ্বরীরও ভালো লেগেছিল তার দূর সম্পর্কের দাদা জগন্নাথকে। যেমন দেখতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি গানের গলা কিন্তু এক গোত্র যে। তারও ভালোলাগাটা মিলনে প্রস্ফুটিত হ'তে পারেনি। বিয়ের সময় দুজনের মনের নেপথ্যলোকের ইতিহাস নেপথ্যেই থেকে গেল। কিন্তু এসব সত্বেও আশ্চর্য জিনিস হল একটা। দুজনেরই দুজনকে ভালো লেগে গেল। সুশীলাও নিমন্ত্রিত হয়েছিল বিয়েতে।

সে এসে ভালো একটি শাড়ি উপহার দিল সুরেশ্বরীকে, আর চার কপি মাসিক পত্রিকা—'অর্ঘ্য'। হেসে বলল—'বিষ্ণুবাবু খুব ভাল কবিতা লিখতে পারেন। তার প্রমাণ এই কাগজগুলিতে আছে। পড়ে দেখো।" সুশীলা বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তারও বিয়ে হয়েছিল একজন ডাক্তারের সঙ্গে কুল-গোত্র-কোষ্ঠি মিলিয়েই। বিয়ের পর সুশীলাকে চলে' যেতে হল কানপুরে। সুশীলার স্বামী সেখানেই চাকরি করতেন তখন।

প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে। ওদের বিয়ে হয়েছিল ১৯২২ খৃষ্টাব্দে, দেখতে দেখতে ১৯৭২ এসে পড়ল। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব, সুভাষ বসুর নেতাজীতে রূপান্তরিত হওয়া, হিন্দুস্থান-পাকিস্থান, হিন্দু-মুসলমান, রিফিউজী, বাঙালী-অবাঙালী সমস্যা, বাংলাদেশে বহু যুযুধান রাজনৈতিক দলের হুহুঙ্কার, তাদের অমানুষিক হানাহানি, কালোবাজার, ঘরে ঘরে বেকার ছেলে-মেয়ে, পথে পথে মিছিল আর শ্লোগান, জিনিসপত্রের আতঙ্কজনক মূল্যবৃদ্ধি—চার আনা সের বেগুন চার টাকা সেরে বিকুচ্ছে—মাছ, মাংস ছোঁবার উপায় নেই। এ সবই দেখেছে তারা, সবই সহ্য করেছে। কিন্তু যেটা সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেল সেটা পূর্ববঙ্গে ইয়াহিয়া খানের নারকীয় অত্যাচার।

সুরেশ্বরীর অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে। ছোট ছেলে দীপঙ্করের বয়স পঁচিশ। জুলফি রেখেছে, গোঁফও রেখেছে জমকালো গোছের। চমৎকার বলিষ্ঠ চেহারা। পরনে চোং প্যাণ্ট, হাত কাটা কামিজ, পায়ে চপ্‌পল, ভারি স্মার্ট। এয়ার ফোর্সে যোগ দিয়েছে সম্প্রতি। বিষ্ণুচরণ পক্ষাঘাতগ্রস্থ। বিছানায় জড়বৎ পড়ে থাকেন। তাঁর সেবার ভার নিয়েছে তাঁর বড় ছেলের বউ কমলা। বিষ্ণুচরণের মেয়ের সংখ্যাই বেশী, ছেলে মাত্র দুটি। মেয়েদের সব বিয়ে হয়ে গেছে।

অনেক দূরে দূরে বিয়ে হয়েছে, কচিৎ কখনও আসে তারা। কমলাই বাড়ির গৃহিনী এখন। সুরেশ্বরী ওর হাতেই সব ছেড়ে দিয়েছে। সুরেশ্বরীর এখন কাজ সিনেমা দেখে বেড়ানো। তোড়ি তার সঙ্গী। তোড়ি সুশীলার মেয়ে। একমাত্র সন্তান তার। বিধবা হয়েছে সুশীলা। বিয়ের পর অনেকদিন ছেলেপিলে হয়নি সুশীলার। অনেক দিন পরে বুড়ো বয়সে তোড়ির জন্ম। কানপুরে এক ওস্তাদ ওর নাম দিয়েছিল তোড়ি। তোড়ির বয়স এখন উনিশ। এম-এ পড়ছে। দেখতে মোটে ভাল নয়, কালো রঙ্, খাঁদা নাক, চোখ দুটোই ভালো। ছোট ছোট, কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত। দুষ্টুমিভরা হাসিতে চিকমিক করছে। সুশীলা স্বামীর মৃত্যুর পরই চলে এসেছে কলকাতায় নিজের বাড়িতে। সে বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান ছিল তাই বাড়িটি পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে। বিষ্ণুচরণের সম্বন্ধে আর তার মোহ নেই। সে এখন দিনরাত ব্যস্ত পরলোক নিয়ে। ঠাকুর ঘরেই বেশীর ভাগ থাকে। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার, সুরেশ্বরীকে সে-ও ভালবেসেছে। তোড়ির ভার তার উপর দিয়েই নিশ্চিন্ত আছে। তোড়ি অনেক সময় ওই বাড়ীতে খায়, ওই বাড়িতেই ঘুমোয় পর্য্যন্ত। তোড়ি সুরেশ্বরীর বন্ধু এখন। তোড়ি সুরেশ্বরীকে নিয়ে কোথায় না গেছে। সিনেমা তো বটেই, কলেজের সাহিত্য-সভা, কফি হাউস, ক্রিকেট ম্যাচ, গড়ের মাঠে ইন্দিরাজীর বক্তৃতা, নানা জায়গায় চিত্র প্রদর্শনী, সব জায়গায় গেছে সুরেশ্বরী তোড়ির সঙ্গে। তোড়ির নানারকম অসঙ্গত আবদার সুশীলা সহ্য করে না, সুরেশ্বরী করে। তোড়ির দামী দামী শাড়ি সুরেশ্বরীই কিনে দিয়েছে। সেদিন একটা দামী ষ্টোল কিনতে সাড়ে তিনশো টাকা খরচ করতে হল সুরেশ্বরীকে। একটা ছোট্ট পিঠ-ঢাকা র‍্যাপারের জন্যে অত টাকা খরচ করবার ইচ্ছা ছিল না সুরেশ্বরীর। কিন্তু তোড়ি জেদী। ও যখন ধরেছে, কিনবেই। ষ্টোলের কাশ্মীরি কাজ নাকি আশ্চর্য সুন্দর। কাজের মর্ম সুরেশ্বরী বোঝেনি কিছু, কিন্তু কিনে দিতে হয়েছে। আর

একদিন তোড়ি অবাক করে' দিয়েছিল সুরেশ্বরীকে। কোট প্যান্ট পরে' হাজির হল কোত্থেকে। মাথায় ফেল্ট হ্যাট। সুরেশ্বরী চিনতে পারেনি প্রথমে। হকচকিয়ে গিয়েছিল। খিল খিল করে' হেসে উঠেছিল তোড়ি সুর-মার ভয় দেখে। সুরেশ্বরীকে সে সুর-মা বলে ডাকে। বললে—'তোমাকে নিয়ে চীনে হোটেলে যাব। তাই সায়েব সেজেছি। সায়েবি পোষাককে খুব খাতির করে ওরা। আমি হব ছেলে, তুমি হবে আমার মা। ওরা কী সুন্দর চিংড়ি মাছ রান্না করে তোমাকে খাওয়াব।'

সুরেশ্বরী যাননি। সেখানে যাননি বটে, কিন্তু ওদের বটানিক্যাল গার্ডেনের পিকনিকে যেতে হয়েছিল। সেখানে ওদের খিচুড়ি রাঁধবার ভার নিতে হয়েছিল। কি যে জ্বালাতন করে তাঁকে মেয়েটা। সুরেশ্বরীর মুশকিল রাগ করতে পারেন না তিনি মেয়েটার উপর। কি যে একটা মায়া মাখান আছে ওর চোখ-মুখে। আর যখন আবদার করে কি অপরূপ সুন্দরই না দেখায়।

একদিন তোড়ি কিন্তু এমন একটা আবদার করে বসল যে ঘাবড়ে গেলেন সুরেশ্বরী। বিকেলবেলা তর তর করে' উঠে এল তোড়ি সিঁড়ি দিয়ে। তার হাতে একটি সিঁদুর কৌটো।

"আমার সিঁথেয় সিঁদুর পরিয়ে দাও সুর-মা"

"কুমারী মেয়ে সিঁথেয় সিঁদুর পরে নাকি কখনও। তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি"

"আমার বিয়ে হয়ে গেছে আজ সকালে। রেজস্ট্রী করে' বিয়ে হয়েছে—"

"সে কি! কোথায়, কার সঙ্গে—"

"দীপুদার সঙ্গে। দীপুদাকে কাল বাংলাদেশের যুদ্ধে যেতে হবে, তাই আজই বিয়েটা সেরে ফেললাম আমরা—সিঁদুর পরিয়ে দাও, হাঁ করে দেখছ কি—"

'নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল সুরেশ্বরী। হঠাৎ তার মনে হল আমি যা পারিনি এরা তা পেরেছে।

সেদিন বিকেলে তোড়ি আর দীপঙ্করের 'হনিমুন' জমেছিল গড়ের মাঠে একটা ফুচকাওলাকে কেন্দ্র করে। তোড়ি হঠাৎ দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললে "তোমার আজ অন্তত একটা সিল্কের পাঞ্জাবী পরা উচিত ছিল। হাজার হোক তুমি নায়ক—"

দীপঙ্কর হেসে বলল—"আমি নায়ক নই, নীত"—তারপর হো হো করে হেসে উঠল দুজনেই।

গল্প লেখা শেষ করে' শুয়েছিলাম ইজিচেয়ারে। চোখ বুজে দেখতে চেষ্টা করেছিলাম তোড়ি দীপঙ্করকে।

হঠাৎ একটি ছোকরা প্রবেশ করল কপাট ঠেলে। ছোকরার গোঁফ, দাঁড়ি, জুলফি চমৎকার। পরনে একটি চক্‌রা-বক্‌রা ছিটের হাফসার্ট, মনে হয় কোনও পরদা বা টেবিল ঢাকা কাপড় দিয়ে বানিয়েছে ওটা। কালো চোং প্যাণ্ট আর চপ্‌পল তো আছেই।

"আসুন, কে আপনি—"

"আমি ১৯১২এর তরুণ একজন। প্রাচীনকে উড়িয়ে দিয়ে নবীনকে স্থাপন করতে চাই। দুটো জায়গায় কিন্তু আটকে গেছি, তাই আপনার পরামর্শ নিতে এলাম।"

"কোনও নবীনের কাছে যাও, আমিও তো বুড়ো"

"তবু আপনার পরামর্শটা শুনলে কোনও ক্ষতি নেই। দেবেন?"

"কি বিষয়ে বল—"

"আমরা দুটো জায়গায় আটকে গেছি। প্রথম, সেকালের মতো খাদ্যদ্রব্য এখনও রেঁধে না খেলে ভালো লাগে না। দ্বিতীয় প্রেম করতে হলে পুরুষের চাই মেয়ে আর মেয়ের চাই পুরুষ। এই দুটো ব্যাপারে এখনও সেকেলে হয়ে আছি আমরা। কি করি বলুন তো—"

কি উত্তর দিতাম জানি না। কিন্তু ঘুমটা ভেঙে গেল একটা মোটর দাঁড়ানোর শব্দে। স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম আমার নাতনী নিজে মোটর-ড্রাইভ করে ফিরল যেন কোথা থেকে। তার টকটকে লাল পিঠকাটা ব্লাউসের নীচে দেখতে পেলাম তার ধপধপে ফরসা রংটা। নাতনী ঘরে ঢুকেই বললে—"দাছ তোমার জন্যে একটা নতুন খাবার এনেছি। তোমরা তো বরাবর মুর্গীর ঝোল, না হয় বড় জোর মুর্গীর রোষ্ট খেয়েছ। আমি তোমাকে আজ নতুন একটা রান্না খাওয়াব"

"কি কি"

"চিলি-চিকেন"

শ্রীমতী সীমা

কখন যে কোনদিক দিয়ে কি হয়ে যায় কেমন করে যে ফসকা গেরো শক্ত গিট হয়, শক্ত গেরো আলগা হয়ে যায় আগে থাকতে নির্ণয় করা যায় না তা। ভুসিবাবু (ভালো মাম ভূষণ দে) মালদার লোক। কালো সাদা নানা পথে মালক্ষ্মী তাঁর শ্রীবৃদ্ধি করে আসছেন বহুকাল থেকে। শহরে গোটাতিনেক বাড়ি হয়েছে, ব্যাঙ্কের খাতাতেও জমেছে কয়েক লক্ষ। অনেকে তাঁকে সিনেমা লাইনে নাবাতে চেষ্টা করেছিল, অনেকে বলেছিল ভালো একটা মাসিকপত্র বার করে সাহিত্য জগতে যুগান্তর আনুন, ভুসিবাবু রাজি হন নি। তিনি সুনিশ্চিত পথে চলতে চান। বন্দকী রেখে সুদে টাকা ধার দেওয়াই তাঁর প্রধান ব্যবসায়। মাঝে মধ্যে অবশ্য চোরা-পথে দমকা কিছু টাকা পেয়ে যান তিনি। কিন্তু সেই চোরা-পথেও তিনি আটঘাট না বেঁধে অগ্রসর হন না। ভুসিবাবু লোক খুব খারাপ নন। তাঁর পরিচিত মহলে সকলেই তাঁকে ভালবাসে।

ঈষৎ স্থূলকায় ভুসিবাবু এখনও খুব সেকেলে। ফতুয়া পরেন, থান পরেন। পায়ে দেন চীনাবাজারের সেকেলে জুতো। সেকেলে ধরনে দানও করেন। ডান হাতের দান বাঁ হাত জানতে পারে না। এমন লোকের সুখে থাকার কথা। কিন্তু তাঁর একমাত্র সন্তান মাতৃহীনা কন্যা তাঁকে সুখে থাকতে দিচ্ছে না। অদ্ভুত প্রকৃতির এই মেয়ে হয়েছে ভুসিবাবুর। খারাপ নয় মোটেই, কিন্তু ভুসিবাবু বুঝতে পারেন না তাকে ঠিক। যখন তার বয়স বারো তেরো তখনই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করেছিল সে।

বাবাকে এসে বলল—'বাবা, আমার ভালো নামটা বলে দাও।'

'কেন ?'

'ওতে অহঙ্কার প্রকাশ পায়। তাছাড়া আমি আলোর মতো অত সুন্দর নই তো। আমার রং কালো, গড়নও ভালো নয়, আলো নাম আমার মানাচ্ছে না ঠিক। বদলে দাও ওটা—'

'কি নাম মানাবে তাহলে তোকে ?'

'এই টুপসি, ঝুপসি যাহোক কিছু দাও না একটা—'

ভুসিবাবু স্মিতমুখে চেয়ে রইলেন কন্যার দিকে ক্ষণকাল। তারপর বললেন—'তুই নিজেই রাখ একটা—'

কয়েকদিন পরে নিজেই সে নিজের নামকরণ করেছিল—সীমা। ক্রমশ ভুসিবাবু হৃদয়ঙ্গম করলেন যে ও যদিও নিজের নাম রেখেছে সীমা কিন্তু বারবার সীমা অতিক্রম করাই ওর স্বভাব। ভুসিবাবুর মাঝে মাঝে মনে হয় খুব ছেলেবেলায় ওর যদি বিয়ে দিয়ে দিতেন ভালো হত তাহলে। কিন্তু একমাত্র কন্যাকে এত তাড়াতাড়ি পরের ঘরে পাঠাতে মন সরেনি তাঁর। গোপন ইচ্ছা ছিল একটি ঘরজামাই করবার। ভেবেছিলেন টাকার জাল ফেলে একটি মনোমত জামাই ধরবেন। জালে অনেক ছোকরাই ধরা পড়েছিল কিন্তু মনোমত কাউকে পান নি তিনি। বেশির ভাগই কুৎসিত। কেউ তালগাছের মতো লম্বা কেউ অতিশয় বেঁটে, কেউ থলথলে মোটা, কারও থেঁকুরে-

মার্কা চেহারা। অধিকাংশই লম্বা জুলফিদার চোংপ্যাণ্ট পরা। সুশ্রী একটিও নয়। সীমা লেখাপড়ায় খুব ভালো। বি এ-তে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়ে এম এ পড়ছে। এ ছাড়াও তার অনেক রকম 'হবি'। ফোটো তোলে। ইডেন গার্ডেনের, চিড়িয়াখানায়, কলেজের ছেলেমেয়েদের, রাস্তার ভীড়ের—নানারকম ফোটোতে তার অনেক অ্যালবাম ভরতি। তার আর একটা 'হবি' খবরের কাগজের 'কাটিং' কেটে রাখা। সাহিত্য বিষয়ে, বিজ্ঞান-বিষয়ে, রাজনীতি বিষয়ে নানা কাটিং সংগ্রহ করে সে নানা পত্রিকা থেকে। প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা আলাদা ফাইল করছে সে। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে সর্বদা। আড্ডাবাজ মেয়ে নয়, ঘরেই থাকে। বিশেষ বন্ধু বৃদ্ধ ওস্তাদ গণি মিঞা। তাঁর কাছে সেতার শেখে। মোটরে করে রোজ নিয়ে আসে তাঁকে। ভুসিবাবু টাকার স্তূপের উপর বসে বসে দেখেন মেয়ে তাঁর নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। কুপথে গেলে রাগারাগি করতে পারতেন, কিন্তু সীমা তো কুপথগামিনী নয়—অথচ নাগালের বাইরে। তাছাড়া এও তিনি অনুভব করলেন ওর যৌবন যে চলে যাচ্ছে। আর বিয়ে না দিলে কবে বিয়ে হবে। অথচ সীমার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কইতে ভয় করে তাঁর। তবু মরিয়া হয়ে একদিন প্রস্তাবটা করলেন তিনি।

'এবার তোর বিয়ে দেব ভেবেছি সীমা। আপত্তি নেই তো?'

ভুসিবাবু ভেবেছিলেন সীমা বুঝি সোজা 'না' বলবে। কিন্তু সীমা সলজ্জ হাসি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

'না, বিয়ে করতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। ভালো ছেলে কি ঘর-জামাই হতে রাজী হবে? বাজে ছেলেকে আমি বিয়ে করব না।'

ভুসিবাবু নিজের মাথায় একবার হাত বুলোলেন। এ সন্দেহ তাঁরও আছে। ভালো ছেলেকে ঘর-জামাইরূপে পাওয়া সত্যিই শক্ত। গোপনে গোপনে এ চেষ্টা তিনি আগেই করেছিলেন। সফল-

কাম হন নি। তবু যে ধ্রুব বিশ্বাসকে আঁকড়ে তিনি জীবনে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সেই বিশ্বাসকে আঁকড়েই তিনি এ ব্যাপারে আবার অগ্রসর হবেন মনস্থ করলেন। টাকার টোপ ফেলতে লাগলেন চতুর্দিকে। এবারও অনেক চুনোপুঁটি ধরা পড়ল। ভুসি-বাবু তাঁর অভিজ্ঞ মুহুরি বিলটুবাবুকে নির্বাচনের ভার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ভালো ছেলেব খবর পেলে আমাকে জানাবেন। টাকা যা লাগে খবচ করব কিন্তু পাত্রটি ভালো হওয়া চাই।'

মাস দুই পরে বিলটুবাবু সৎপাত্রেব খবর আনলেন একটি। বললেন—'ছেলেটি ভালো। তবে সীমু মায়ের চেয়ে মাত্র বছর খানেক বড়। গতবার এম. এ. পাস করেছে। আমাদের খাতক হরিশবাবুর ছেলে। হরিশবাবু তাঁর স্ত্রীর গহনা বাঁধা দিয়ে আমাদের কাছে বছর তিনেক পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। এখনও শোধ করতে পারেন নি। সুদও দেন নি এক পয়সা। দিতে পারবেন বলেও মনে হয় না। পাঁচটি অবিবাহিতা মেয়ে আর চারটি নাবালক ছেলে। ওই বড় ছেলে সর্বোত্তমই সবে লেখাপড়া শেষ করে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখনও জোটে নি কোথাও। আমি প্রস্তাবটা করতেই আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন হরিশবাবু। বললেন—ভুসিবাবুর সঙ্গে কুটুম্বিতা করা তো মহাভাগ্য। ঘর-জামাই হতে দোষ কি আছে? কত রাজা মহারাজাই তো হয় ঘরজামাই না হয় পুষ্যিপুত্তুর —না, আমার কোন আপত্তি নেই। আমার ছেলেরও আপত্তি হবে না। কিন্তু—'থেমে গেলেন বিলটু বাবু।

'কিন্তু কি—'

'ওদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে গেলে যে পাঁচ হাজার টাকা উনি ধার নিয়েছেন সেটা ছেড়ে দিতে হবে। গয়নাগুলোও ফেরত দিতে হবে। তাছাড়া উনি বলছেন ওই ছেলেটিই এখন ওঁর আশা-ভরসা। তাকে যদি আপনারা ঘর জামাই করে রেখে দেন ওঁর সংসার চলবে কি করে? তাই উনি চাইছেন যে আগামী কুড়ি বছর অন্তত

মাসে মাসে পাঁচ শো টাকা করে দিয়ে যেতে হবে ওঁদের। কারণ ওঁর দায় অনেক। মেয়েদের পড়াতে হবে বিয়ে দিতে হবে। ছেলেদের মানুষ করতে হবে।'

ভুসিবাবু মাথায় একবার হাত বুলুলেন।

তারপর বললেন—'ভালো জিনিস কিনতে হলে ন্যায্য দাম দিতে হবে বই কি। ছেলেটি দেখতে কেমন, নামটি তো জমকালো—'

'দেখতেও ভালো।'

'ভালো মানে, কি রকম?'

বিলটুবাবু তেমন বর্ণনাপটু লোক নন। সংক্ষেপে তাই বললেন, 'একটু লালুলালু গোছের। মাথার চুল সিনেমা-নায়কদের মতো ছাঁটা। চোখ দুটি বড় বড়। রং ফরসা—'

'আচ্ছা, আমি একদিন গিয়ে দেখে আসব।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই সবচেয়ে ভালো।'

ভুসিবাবু একদিন গিয়ে দেখে এলেন সর্বোত্তমকে। খুব পছন্দ হল তাঁর। হরিশবাবুকে বললেন, 'আপনি যা চেয়েছেন তা দেব। আপনারা মেয়ে কবে দেখবেন?'

হরিশবাবু হাত কচলে বললেন—'মেয়ে দেখার আর দরকার কি?'

ভুসিবাবু রাজি হলেন না এতে।

বললেন—'ছেলেমেয়ে দুজনেরই পরস্পরকে একবার দেখা দরকার বিয়ের আগে।'

'বেশ, সর্বোত্তম কালই গিয়ে দেখে আসুক তাহলে—'

সব শুনে সীমা বললে—'আমি কারো কাছে বেরুবো না। তুমি আমার পাশের ঘরে এনে বসিও, আমি আমার ঘর থেকেই খড়খড়ি ফাঁক করে দেখে নেব। যদি ভালো লাগে, তখন গিয়ে আলাপ করব।'

তাই হল।

ঝোলা পা-জামা আর চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে

সর্বোত্তম এসে বসল পাশের ঘরে। প্রচুর জলখাবার নিয়ে এল চাকর রসিকলাল।

ভুসিবাবু বললেন—'খাও বাবা খাও। আমি সীমাকে ডেকে আনছি—'

ঘরের ভিতর যেতেই সীমা বলল—'ওর নাম তো টিপুসুলতান। টোকাটুকি করে পাস করেছে। ওকে বিয়ে করব কি। ও তো একটি গবেট। আমার একটা 'মস্তান'দের অ্যালবাম আছে। তাতে ছবি আছে ওর। একদিন স্ন্যাপ তুলেছিলাম—দেখবে?'

ভুসিবাবু আবার মাথায় হাত বুলুলেন। বুঝলেন মেয়েটা আবার তাঁর নাগালের বাইরে চলে গেল।

ঠাকুমার কাণ্ড

পৌত্রের বয়স আট বছর, ঠাকুরদার বয়স ছিয়াত্তর। ঠাকুরমার বয়স ছেষট্টি। ঠাকুমাই বিচারক হলেন সেদিন। নাতি আর ঠাকুরদার প্রায়ই ম্যাচ হয়। কখনও লুডোর, কখনও স্নেক-ল্যাডারের, কখনও ক্যারমের। এ সবের হার-জিত তো সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। কিন্তু সেদিন যে ম্যাচটা হচ্ছিল তা একটু অন্যরকম। ঠাকুমা একটা কাল্পনিক গল্পের আরম্ভটা বলে দিয়েছিলেন। কথা ছিল খোকন সেটা নিজের মত করে শেষ করবে, ঠাকুরদাও শেষ করবেন নিজের মত করে। দুজনের গল্পই ঠাকুমা শুনবেন। যার গল্প তাঁর বেশি ভাল লাগবে তার গলায় তিনি একটা মোটা জুঁইফুলের মালা পরিয়ে দেবেন।

গল্পের আরম্ভটা হচ্ছে এই :

'অন্ধকার জঙ্গল। বড় বড় গাছ চতুর্দিকে। চাঁদ উঠেছে কিন্তু চাঁদের আলো জঙ্গলের ভেতর ঢুকতে পারে নি, এত ঘন সে বন। শুধু অন্ধকার নয়। মাঝে মাঝে বাঘ-সিংহের ডাক শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ

দেখা গেল রাজপুত্র একটা গাছের উপর উঠে বসে আছে। তার মাথার মুকুটের উপর চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে—'

ঠাকুমা বললেন—'এইবার তোমরা ভাব গল্পটা কি করে শেষ হবে। কাল তোমাদের গল্প শুনব।'

ঠাকুরদা ভাবতে লাগলেন।

খোকনও ভাবতে লাগল।

॥ ২ ॥

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় ছাতে মাদুর পাতা হল। তার উপর ঠাকুমা বসলেন তাঁর পানের বাটা নিয়ে। ঠাকুরদার ইজিচেয়ারটাও এল ছাতে। অর্জুন গড়গড়ায় তামাক দিয়ে গেল। খোকন বসল ছোট্ট একটা মোড়ায়। ঠাকুমা মুখে একখিলি পান ফেলে দিয়ে বললেন, 'তোমরা রেডি ?'

খোকন বললে—'হ্যাঁ রেডি।'

ঠাকুরদাও বললেন—'আমিও রেডি।'

খোকন বললে—'কে আগে বলবে—'

ঠাকুমা তাঁর ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমা আঙুল দুটি তুলে বললেন—'একটা ধর।'

খোকন তর্জনীটা ধরতেই ঠাকুমা বললেন—'তুই আগে বল।'

খোকন শুরু করল তার গল্প।

'যে বনে সেই রাজপুত্র ঢুকেছিল তা সাধারণ জঙ্গল নয়। তা মায়া রাক্ষসীর জঙ্গল। জঙ্গলে কিছুদূর ঢুকেই অন্ধকার হয়ে গেল। তারপরই বাঘ-সিংহ ডাকতে লাগল। রাজপুত্র ধনুকে তীর লাগিয়ে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল যদি কোন বাঘ বা সিংহকে দেখতে পায়। হঠাৎ একটা বাঘকে দেখতে পেল সে। দেখে একটু অবাক হয়ে গেল। বাঘের মুখের নিচের দিকটা ঠিক যেন বাঘের মত নয়। মেয়ে-মানুষের মত। রাজপুত্র তখনও ঠিক বুঝতে পারে নি ওরা সত্যি বাঘ নয়,

ওরা মায়া-বাঘ। মায়া-রাক্ষসীই বাঘ সেজে তাকে ভয় দেখাচ্ছে। রাজপুত্র বুঝতে পারে নি প্রথমে, তাই বাঘের বুক লক্ষ্য করে সে তীর ছুঁড়ল একটা। তীর ঠিক বুকের মাঝখানে বিঁধল, কিন্তু বাঘ পড়ল না। মায়া-বাঘ যে। আবার তীর ছুঁড়ল রাজপুত্র। আবার বাঘের বুকে বিঁধল। বাঘ কিন্তু মরে না। আর একটা বাঘ এল, তারপর আর একটা, তার পর আর একটা। রাজপুত্র পাগলের মত তীর ছুঁড়তে লাগল। সব তীরগুলোই তাদের গায়ে বিঁধল, কিন্তু পড়ল না কেউ। হঠাৎ একটা বাঘ চেঁচিয়ে মানুষের ভাষায় বলে উঠল—রাজপুত্র তুমি আমাদের বন্দী। তোমায় আমরা মারব না, বন্দী করে রাখব। তুমি এ জঙ্গল থেকে আর বেরুতে পারবে না। ওরে তোরা আয়, আয়, আয়। ঘিরে ফেল রাজপুত্রকে। পিল পিল করে আরও বাঘ-সিংহ আসতে লাগল।

রাজপুত্র দেখলে তার তূণে আর তীর নেই। আর তীর থাকলেই বা কি হত। প্রত্যেক বাঘটার বুকে তীর বিঁধছে, অথচ কেউ মরছে না। ভয় পেয়ে গেল রাজপুত্র। ঠিক সামনেই বড় একটা গাছ ছিল তাতে উঠে পড়ল সে। একেবারে মগডালের কাছাকাছি গিয়ে বসল একটা ডালে। ভাবতে লাগল আমি তো কখনও কোনও পাপ করি নি, ভগবান আমাকে এ বিপদে ফেললেন কেন? আমার বাবাকে প্রজারা সবাই ভালবাসে। কিছুদিন থেকে তাঁর রাজত্বে ভয়ানক ডাকাতি হচ্ছে। অনেকে বলছে ডাকাতরা নররূপী রাক্ষস। এই বনেই কি সেই রাক্ষসদের বাস? আমাদের অনেক সৈন্য নষ্ট করছে এরা। এদের হাত থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই? হে ভগবান, আমাদের বাঁচাও। রাজপুত্র আকাশের দিকে মুখ তুলে হাতজোড় করে বসে রইল।'

এই সময় অশ্বিনী এসে বলল—'মা ফুলের মালা এনেছি, এই নিন।'

কাগজের ঠোঙার ভিতর মালাটি ছিল। ঠাকুমা সেটি পানের বাটার পাশে রাখলেন।

খোকন আবার বলতে শুরু করল।

'রাজপুত্র হাতজোড় করে বসেছিল এমন সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সে দেখতে পেল আকাশের একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে। অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে। নক্ষত্র নীচে আসছে কেন? আলোয় আলোয় ভরে গেল চারিদিক। তারপর রাজপুত্র বুঝতে পারল—ওটা নক্ষত্র নয়, ওটা জ্যোতির্ময় রথ একটা। এরোপ্লেনের মত দেখতে অনেকটা। কিন্তু এরোপ্লেনের মত শব্দ নেই। নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। খুব কাছাকাছি যখন এল তখন রথের ভিতর থেকে কে যেন বললে, রাজপুত্র, ভয় পেও না। আমি ধর্মরাজ। তুমি কি চাও বল? রাজপুত্র বলল—আমার বাবা বড় বিপন্ন। তাঁর রাজ্যে ক্রমাগত ডাকাতি হচ্ছে। অনেকে বলছে ডাকাতরা ছদ্মবেশী রাক্ষস। আমার বাবাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

ধর্মরাজ বললেন—তুমি নিজেও কম বিপদে পড়নি। কিন্তু তুমি নিজের জন্য কিছু না চেয়ে তোমার বাবার জন্য আমার সাহায্য চাইছ এতে আমি খুব খুশি হলাম। আমি তোমার বাবাকেও সাহায্য করব, তোমাকেও করব। তুমি ওই গাছের কোটরের ভিতর ঢুকে বসে থাক আমি আকাশ থেকে দৈবী অস্ত্র নিক্ষেপ করব এখনই। বনের সমস্ত রাক্ষসী এখনি মরে যাবে। তারপর মারব ওই ডাকাতদের। তুমি চুপ করে বসে থাকো। সব রাক্ষস-রাক্ষসী যখন মরে যাবে তখন তোমার জন্য রথ আনবে সুমন্ত্র সারথী। সেই রথে চেপে তুমি বাড়ি ফিরে যেও।

রাজপুত্রের রামায়ণ পড়া ছিল। তাই সে প্রশ্ন করল—সুমন্ত্র তো রাজা দশরথের সারথী ছিল।

—হ্যাঁ। এখন সে আমার কাছে আছে। রাজা দশরথের এখন তো আর রাজত্ব নেই, তিনি তাই আর রথ রাখেন না। দরকার হলে আমিই তাঁর জন্য রথ পাঠাই। ধর্মরাজের রথ ক্রমশঃ সরে যেতে লাগল। ক্রমশঃ দূরে, দূরে, আরও দূরে চলে গেল। মিলিয়ে গেল

তারপরে। একটু পরেই দুমদাম শব্দ হতে লাগল। আকাশ থেকে অস্ত্র পড়তে লাগল রাক্ষস-রাক্ষসীদের উপর। আর সে কী হাঁউ মাউ চীৎকার। রাজপুত্র কানে আঙুল দিয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে থেমে গেল সব। তারপর সমস্ত আকাশ আলো করে রথ এল।

সুমন্ত্র এসে বললেন, রাজকুমার বাড়ি চলুন।

রাজপুত্র বাড়ি চলে গেল।'

ঠাকুমা আনন্দে গদগদ।

বললেন—'চমৎকার হয়েছে গল্পটা। এইবার তোমার গল্প বল।'

ঠাকুরদা চোখ বুজে গড়গড়ায় মৃদু মৃদু টান দিচ্ছিলেন। কয়েক মিনিট তিনি কোন কথাই বললেন না। তারপর লম্বা একটা টান দিয়ে বললেন—'এইবার শোন। আমার গল্পটা অন্যরকম একটু। শোন—'

বলতে শুরু করলেন ঠাকুরদা।

সেদিন চন্দ্রগ্রহণ। পূর্ণগ্রাস। সবাই গঙ্গাস্নান করছে। চারদিকে প্রচুর ভীড়। একটি ঘাটে কিন্তু ভীড় নেই। চারদিক কানাত দিয়ে ঘেরা। জলের ভিতর পর্যন্ত নেমে গেছে কানাত। রাজবাড়ির লোকেরা এখানে স্নান করবেন। সেই কানাত-ঘেরা জলের মধ্যে জল ছাড়া কিন্তু আর একটি জিনিস ছিল সেটি কারো চোখে পড়ে নি। আকাশের রোহিনী নক্ষত্র প্রতিফলিত হয়েছিল সেখানে। রাজপুত্র যখন সেখানে স্নান করতে এল তখন তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল রোহিনী। মানুষের কি এত রূপ হতে পারে? এ যে দেবতার রূপের চেয়েও সুন্দর। যে চাঁদ রূপের গরবে এত গরবী তার মুখেও তে কলঙ্ক আছে। এ রাজপুত্রের মুখ যে নিষ্কলঙ্ক। অবাক কাণ্ড। এই খবরটি রোহিনী চাঁদকে দিয়ে বললে—সেদিন গঙ্গাস্নানের সময় এব রাজপুত্রকে দেখলাম। সে তোমার চেয়েও সুন্দর। চাঁদ হেসে জবাব দিলেন—কেন বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছ। আমি সাতাশটি

াজকন্যার স্বামী, আমি যদি কুরূপ হতাম তাহলে কি তোমরা আমার
লায় মালা দিতে? মর্ত্যের রাজপুত্র আমার চেয়ে সুন্দর হতেই
ারে না। তোমার চোখ খারাপ হয়ে গেছে, অশ্বিনীকুমারের কাছে
াও। রোহিনী ভ্রূভঙ্গী করে বলল—নিজের চোখেই দেখে এস না।
মন রূপ দেবতাদের কারো নেই। দেবতারা সব হোঁৎকা, কারো
ারটে মুখ, কারো পাঁচটা। কারো চারটে হাত, কারো ইয়া গোঁফ।
াজপুত্রটিকে দেখে এস, ভুল ভেঙে যাবে। চাঁদের মনে কৌতূহল
াগল। রাজপুত্রকে দেখতে হবে একদিন। আমার চেয়েও সুন্দর?
িজের চোখে না দেখলে মানব না এ কথা। দেখতে গিয়ে কিন্তু
ঝতে পারলেন রাজপুত্রের দেখা পাওয়া সহজ নয়। রাজপুত্রকে তা
া রাত্রে কোথাও বেরুতে দেন না। সন্ধ্যের সময়ই রাজপুত্র বাড়ি
ফরে এসে মায়ের কোলে মাথা দিয়ে রূপকথা শোনে। আব
াতের অন্ধকারেই তো চাঁদ ওঠেন। তখন রাজপুত্রকে দেখতে পান
া তিনি, তখন রাজপুত্র ঘরের ভিতর মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শোনে।
রাহিনী খবর দিল—রাজপুত্র রোজ বনে শিকার করতে যায়। সেই
সময় তাকে দেখতে পার। চাঁদ বললেন, কি করে পারব? দিনের
আলোয় আমি দেখতে পাই নাকি! সূর্যের আলোয় আমার চোখ
ধেঁধে যায়।

রোহিনী বলল, তোমার বন্ধু ইন্দ্রধনুকে বল না। তিনি ইন্দ্রকে
কোনও অনুরোধ করলে ইন্দ্র তা ফেলতে পারবে না। ইন্দ্র ইচ্ছে
করলে মেঘ দিয়ে সূর্যকে ঢেকে দিতে পারে। আর সূর্য মেঘে ঢাকা
পড়লে অন্ধকার হয়ে যাবে, তখন তুমি রাজপুত্রকে দেখে নিতে পার।
রাজপুত্র প্রায়ই বনে শিকার করতে যায়। তুমি ইন্দ্রধনুকে বল, সে
সব ব্যবস্থা করবে।

সব শুনে ইন্দ্রধনু খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল, আমি তো
রাজপুত্রকে রোজ দেখতে পাই। আচ্ছা আমি ইন্দ্রদেবকে অনুরোধ
করছি। রাজপুত্র যখন বনে শিকার করতে যাবেন তখন প্রচুর মেঘ

এসে ঢেকে ফেলবে সূর্যকে। আর স্বর্গের পরীরা বাঘ-সিংহ সেজে ভয় দেখাবেন রাজপুত্রকে। তখন রাজপুত্র গাছে উঠে পড়বেন। আর সেই সময় চাঁদ দেখে নেবেন তাকে—

ঠিক তাই হল। রাজপুত্র বনে শিকার করতে যখন ঢুকলেন তখন দিবা দ্বিপ্রহর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকে ঢেকে দিল পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন মেঘে। অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। দিন, রাত্রি হয়ে গেল। চারদিকে ডাকতে লাগল বাঘ-সিংহের দল। সামনেই একটা মস্তবড় শিরীষ গাছ ছিল, তার উপর উঠে পড়ল রাজপুত্র। আকাশের খানিকটা নির্মেঘ ছিল আর সেখানে চাঁদ উৎসুক হয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ দেখলেন তার এক ঝলক জ্যোৎস্না যেন ধরা পড়ে গেছে কার সাদা উষ্ণীষের মুক্তা-মাণিক্যে। চকচক করছে। রাজপুত্রকে দেখতে পেলেন চাঁদ। একটু ঈর্ষা হল, এ-কথা মানতেই হল রোহিনী যা বলেছে তা ঠিক। রাজপুত্র সত্যিই রূপবান।

তারপর আকাশের মেঘ কেটে গেল। অন্তর্ধান করল নকল বাঘ-সিংহরা। আবার রোদ উঠল। রাজপুত্র গাছ থেকে নেমে বাড়ি চলে গেলেন।'

ঠাকুমা বললেন—'খোকনের গল্পটাই বেশী ভাল হয়েছে। কারণ ওঁর গল্পে একটা আদর্শ আছে। ধর্মের জয় হয়েছে শেষে।' খোকনের গলায় গড়ে মালাটা পরিয়ে দিলেন তিনি। খোকন দৌড়ে নীচে নেমে গেল মাকে মালাটা দেখাবে বলে।

ঠাকুরদা ঠাকুমার দিকে চেয়ে বললেন—'তুমি তো আর্টের কিছু বোঝা না দেখছি। হঠাৎ বিচারক হতে গেলে কেন?'

ঠাকুমা হেসে বললেন—'রাগ কোর না লক্ষ্মীটি। আর্ট বুঝি না, কিন্তু খোকনের গল্পটাই আমার বেশী ভাল লেগেছে। ওইটুকু ছেলে কেমন চমৎকার গল্পটি বানিয়েছে বল তো? তাই ওকেই মালাটা দিলাম। তাছাড়া ও আমাদের খোকন যে—'

তারপর ঠাকুমা উঠে গিয়ে বুড়ো ঠাকুরদার তোবড়ানো গালে ছোট্ট একটু চুমু দিয়ে বললেন—'তোমারটাও ভাল হয়েছে—।'

আকাশে চাঁদ উঠেছিল তখন। ফুর ফুর করে একটু হাওয়াও বয়ে গেল।

অধ্যাপক সুজিত সেন

অধ্যাপক সুজিত সেন খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কল্পনা উদীপ্ত হয়ে উঠল।

গভীর রাত্রি। বিশাল মরুভূমিতে কনকনে হাওয়া বইছে। আকাশে অগণিত উজ্জ্বল নক্ষত্র চেয়ে আছে বেদুঈন ওয়াজিদের দিকে। অশ্বারূঢ় ওয়াজিদ অধীর চিত্তে অপেক্ষা করছে নূর-এর জন্য। বেদুঈনদের দলপতি জব্বর খাঁর অপরূপ রূপসী কন্যা নূর। ওয়াজিদ অভিজাত বংশের ছেলে নয়। তাই জব্বর খাঁ তাকে জামাতৃপদে বরণ করতে অনিচ্ছুক। কিন্তু ওয়াজিদ নূরকে ভালবাসে, নূরও ভালবাসে ওয়াজিদকে। সুতরাং তারা ঠিক করেছে পালাবে। দূরে তাঁবুর সারি দেখা যাচ্ছে। ওয়াজিদের ঘোড়াটাও অধীর হয়ে উঠছে। সে ঘাড় বেঁকিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে কেবল। নূর বলেছিল শুকতারা যখন উঠবে তখন সে নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে। কিন্তু শুকতারা তো অনেক্ষণ উঠে গেছে—নূর এখনও আসছে না কেন। তাহলে কি আবিদ এসে গেছে? আবিদ ওয়াজিদের প্রতিদ্বন্দ্বী। তার সঙ্গেই নূরের বিয়ে দেবেন ঠিক করছেন জব্বর খাঁ।

হঠাৎ মরুভুমির বালি যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠল। ওয়াজিদ, আমি এসেছি—

ওয়াজিদ সবিস্ময়ে দেখল মরুভূমির উপর সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে আসছে নূর।

আবিদ এসে গেছে। তাই এ রকম ভাবে আসতে হল। হেঁটে এলে সে দেখতে পেত।

ওয়াজিদ সঙ্গে সঙ্গে নেমে তুলে নিল নূরকে। ওয়াজিদ ঘোড়ায় চড়ল, নূব বসল তার পিছনে তাকে জড়িয়ে।

অন্ধকার ভেদ করে ছুটতে লাগল ঘোড়া।

একটু পরেই আর একটি ঘোড়া বেরুল। আবিদেব ঘোড়া। সে ঘোড়াও ছুটতে লাগল।

তারা এখনও ছুটছে। চিরকাল ছুটছে ইতিহাসের পটভূমিকায়।

রূপ কিন্তু বদলে যাচ্ছে।

যে পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পালিয়েছিলেন, আর যাঁর পিছনে পিছনে ছুটেছিল জয়চন্দ্রের সৈন্যরা সে পৃথ্বীরাজ আর বেদুঈন ওয়াজিদের বাইরের রূপটা কেবল আলাদা। ভিতরের প্রেরণা কিন্তু এক। ওয়াজিদের কি হয়েছিল তা জানা নেই কিন্তু পৃথ্বীরাজের পরিণতি ইতিহাসে লেখা আছে। জয়চন্দ্র ডেকে এনেছিল মহম্মদ ঘোরীকে। একবার নয়, দু'বার। পৃথ্বীরাজকে জীবন দিয়ে 'প্রেমের মূল্য দিতে হয়েছিল। মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন তিনি।

খবরের কাগজে একটা খবর পড়ে' ইতিহাসের অধ্যাপক সুজিত সেনের মনে এই কথাগুলি জাগল। একজন যুবক নাকি একটি মেয়েকে এরোপ্লেনে বম্বে নিয়ে চলে গেছে। পরদিন আর একটি এরোপ্লেনে মেয়ের বাবা গিয়ে উপস্থিত। তিনি নাকি মেয়েকে গুলি করে মেরে ফেলেছেন।

এ ধরণের আরও নানা কথা তাঁর মনে জাগল।

সেলিম-আনারকলির প্রেমকাহিনী। সেলিমের বাবা আকবর নাকি প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সেলিমের। আনারকলিকে নাকি জীবন্ত গেঁথে ফেলা হয়েছিল। পর পর মনে পড়ল নূরজাহান জাহাঙ্গীর

়ার শের আফগানের ইতিহাস। অনেক কথাই মনে পড়ল তাঁর।
ানে পড়ল রাধার অভিসারের কথা, মনে পড়ল আয়ান ঘোষের
ক্ষোভ। মনে পড়ল আরও অনেক প্রেমের কাহিনী, ইতিহাসের,
[্রাণের, দৈনন্দিন জীবনের। সেদিনই তো ওই বাড়ীর মেয়েটা
ালাল বাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে। সবই সেই ওয়াজিদ আর নূরের
ল্প। একটু শুধু রকমফের। আর সবার পরিণতিই দুঃখ।
মপরিসীম দুঃখ।

এই সব যখন ভাবছিলেন তিনি তখন দুয়ারের কড়াটা খুব জোরে
জারে বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে কপাট খুলে দিলেন।

একি সুমিতা, কি খবর। হঠাৎ চলে এলি যে কলকাতা থেকে।
ইনি কে?

পায়জামা-আচকান-ফেজ-পরা ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে বললেন,
ইনি আমার স্বামী—সাতদিন আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে।

স্বামী!

লম্বা চওড়া ভদ্রলোকটি আদাব করে, হিন্দীতে বললেন, জি হাঁ।
ম্যয় আপকা দামাদ হুঁ।

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সুজিত সেন। সুমিতা যে এমন
করতে পারে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। নিজের মেয়ের সম্বন্ধে
কোন বাপ ভাবতে পারেন না। মনে করেন তাঁর মেয়ে এমন কাজ
করতে পারে না। বিহ্বল ভাবটা কেটে যাবার পর জিগ্যেস করলেন,
বাংলাতেই করলেন, আপনার নাম কি—

সেলাম করে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, বান্দা কা নাম উসমান খাঁ।
ম্যয় পাঠান হুঁ।

আবার নির্বাক হয়ে গেলেন অধ্যাপক সুজিত সেন।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেন।

এ নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, বক্তৃতাও দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর
মেয়ে একজন মুসলমানকে বিয়ে করেছে এতে তিনি খুশি হলেন না।

মেয়ের দিকে চেয়ে দেখলেন মেয়ে আনত চক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে মুচকি হাসি।

হঠাৎ পাশের ঘরে চলে গেলেন। পাশের ঘর থেকে ফিরে এলেন একটি রিভলভার নিয়ে।

মেয়েকে বললেন, বিবাহে কিছু যৌতুক দিতে হয়। এইটি নাও। যে পথে তুমি পা বাড়িয়েছ সে পথে অনেক বিপদ। বিপদে পড়লে এটি তোমার কাজে লাগতে পাবে। রিভলবরটি দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি ঘর থেকে।

তেতলার ছাদে উঠলেন। ছাদ থেকে দেখতে পেলেন নীচে একটি মোটর সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই উসমান খাঁ এসে তাতে সওয়ার হলেন। আর তাঁর মেয়ে তাঁর পিছনে উঠে বসল। অধ্যাপক সেনের আবার মনে হল সংযুক্তাও পৃথ্বীরাজের ঘোড়ার পিছনে উঠে বসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও মনে হল—সংযুক্তা আর পৃথ্বীরাজ এক জাত ছিল। জাতের মোহ কিছুতেই যেতে চায় না।

হঠাৎ মোটর সাইকেলটা গর্জন করে উঠল। তারপর ভট ভট করে চলে গেল।

আমি কি পাগল ?

সর্বনাশ। খবরের কাগজে যদিও ঠাট্টা করে লিখেছে—ভারত-মাতা কি কোনও ব্যক্তিবিশেষ যে তিনি পালিয়ে যাবেন? ভারতকে মাতারূপে বর্ণনা করেছেন একদল কবি, হয়তো, আর একদল কবি ভারতকে পিতারূপে আঁকবেন। কবিদের রূপক কাব্যেই মানায়, বাস্তবে নয়। ভারত মাতাও নয়, পিতাও নয়, মাসীও নয়, পিসিও নয়— ভারত একটা দেশ—সে কি পালাতে পারে?

'ভারত-মাতা ভারত ছেড়ে পালিয়ে গেছেন' এ খবর যে কাগজে

বেরিয়েছিল সেটার নাম কি, সে কাগজ আমি কবে পড়েছিলাম. তা মনে নেই। যে কাগজে তার প্রতিবাদ বেরিয়েছিল তা-ও কবে পড়েছি স্মরণ নেই।

কিন্তু তবু জানি না কেন খবরটা বেরিয়েছিল, আমার এই কথা ক্রমাগত মনে হচ্ছে। আর মনে হচ্ছে, সর্বনাশ।

সর্বনাশ তো হয়েইছে আমার। মাথার ঠিক নেই। কিন্তু ওই কথাটা আমার মনে বসে গেছে। ভারত-মাতা পালিয়ে গেছে। কোথায় গেল। না, আমার মাথার ঠিক নেই। বাবাকে কে যেন খুন করেছে, মা গলায় দড়ি দিয়েছেন, বাড়িওলা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বাবা ছ'মাস বাড়িভাড়া দিতে পাবেন নি। আমি শুনেছিলাম পাশের বাড়িব ভূপেশবাবুই নাকি বাবাকে খুন করিয়েছেন। তিনি অন্য পার্টির ছিলেন শুনেছি। তাঁর রাগের আব একটা কারণও ছিল। তিনি তাঁর মেযের সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন। বাবা রাজি হননি। তখন আমরা একটা বস্তিতে বাস করতাম। অধিকাংশই খোলার ঘব। তু'একটা খড়েব চালও ছিল। ভূপেশবাবুরা খোড়ো ঘরেই থাকতেন। তারপর আমি—না, একথাটা এখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, মনে হয় না, না এ ঘটেনি,—কিন্তু তবু—কিন্তু এটাও তো মিথ্যে কথা নয় যে, আমার মাথার ঠিক নেই—কিন্তু তবু যা মনে হচ্ছে তা বলব। আমিই গভীর রাত্রে ভূপেশবাবুর বাড়িতে আগুন দিয়েছিলাম। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। ভূপেশবাবু কি পুড়ে মরেছিলেন? তাঁর মাতৃহীন মেয়েটা? জানি না। আগুন লাগিয়েই পালিয়েছিলাম আমি। সমস্ত বস্তিতেই নাকি আগুন ধরে গিয়েছিল। আমি ছিলাম না। পালিয়েছিলাম। ছুটে পালাই নি, আস্তে আস্তে বড় রাস্তার বড় বড় বাড়িগুলোর ছায়ায় ছায়ায় পা টিপেটিপে পালিয়েছিলাম। ছুটলে কেউ হয়তো ধরে ফেলত। কেউ ধরেনি। হেঁটেছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে হেঁটেছিলাম সেদিন। সেইদিনই প্রথম দেখতে পেয়েছিলাম রাতের কলকাতার

আর একটা রূপ আছে। রাস্তা নির্জন, হঠাৎ একটা মোটরগাড়ি জোরে বেরিয়ে গেল, অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ কোনও গলি থেকে ঠুন্ ঠুন্ করে রিক্সাওলা বেরুল হয়তো। বড় বড় বাড়ি, নিস্তব্ধ সব। কোন কোনও বাড়ির জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে, নীল আলো, চাপা আলো, রহস্যময় ইঙ্গিতভরা আলো। বাড়িব সামনের বারান্দায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে কত লোক, ফুটপাথেও ঘুমুচ্ছে। এক জায়গায় সারি সারি অনেক রিক্সা, রিক্সাওয়ালারা রিক্সার ভিতরই গুটি মেরে শুয়ে আছে। রাস্তাব আলোগুলো জ্বলছে। আলোর শিরস্ত্রাণ-পরা সারি সারি নীরব প্রহরীর দল যেন। মাঝে মাঝে দু'একটা নিবে গেছে। এক জায়গায় হোঁচট্ খেলাম—বাড়ির অন্ধকারে একটা খেঁকি কুকুর গুটিসুটি মেরে শুয়েছিল, দেখতে পাইনি। কুকুরটার আর্ত চীৎকার আলোকিতা নগরীর মহিমাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল। দাঁড়িয়ে গেলাম কয়েক মুহূর্ত। তারপর যা দেখলাম তা আশ্চর্য। কুকুরটা কুণ্ঠিতভাবে ল্যাজ নাড়াতে লাগল, যেন দোষ তারই, আমার নয়। এগিয়ে গেলাম। অনেক দূর এগিয়ে গেলাম। কিছুদূর গিয়ে আবার থামতে হল। রাস্তাব ধারে ফুটপাথের উপর কাঁথাজড়ানো কি যেন একটা পড়ে আছে স্তূপীকৃত হয়ে। আর তার ভিতর থেকে উঠছে ক্ষীণ একটা রোদনধ্বনি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কি এটা? একবার জিগ্যেসও করলাম—কে! কোনও সাড়া এল না। কান্না সমানে চলতে লাগল। তারপর কতক্ষণ হেঁটেছি মনে নেই। অনেকক্ষণ। পা দুটো ব্যথা করছিল। একটা আলোকিত বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম এসে। চারিদিকেই আলো, ইলেকট্রিক আলো, নানা রঙের আলো, সামনে মখমলে সজ্জিত একটা গেট—তার উপরে নহবতখানায় বাজছে শানাই, গেটেব উপর ফুল দিয়ে কায়দা করে লেখা 'স্বাগত'। দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করে দাঁড়িয়ে আছে এ কোন্ রাজপুরী! বিয়ে বাড়ি মনে হচ্ছে। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছিল। প্রত্যাশা-ভরে দাঁড়িয়ে রইলাম হয়তো। এখানে

খেতে পাব কিছু। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুব ফরসা হামদো-মুখো একটি লোক বেরিয়ে এলেন, তাঁর পরণে মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি আর পায়-জামা, হাতে সোনার হাত-ঘড়ি। তাঁর দিকে চেয়ে করুণকণ্ঠে বললাম —'যদি কিছু খেতে দেন—' 'মাফ করো বাবা! এই রঘুবীর, গেট বন্ধ কর দেও। ফালতু আদমি ঘুস যায় গা—'

তিনি ভিতরে চলে গেলেন। রঘুবীর গেট বন্ধ করে দিল। হাঁটতে হাঁটতে শেষে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে পৌঁছলাম। ঘাটে নেমে আঁজলা আঁজলা জল খেলাম। তারপর একটু ছায়া দেখে একটা সিঁড়িব উপরই শুয়ে পড়লাম হাতে মাথা রেখে। ঘুমিয়ে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে।

এটা আমার গৃহত্যাগের পর প্রথম রাত্রির ঘটনা। তারপর অনেক রাত্রি এসেছে। অনেক দিনও। কিন্তু সে সবের সুদীর্ঘ বর্ণনা দেব না। এক বছর ঘুরে বেড়াচ্ছি। দেখেছি অনেক অদ্ভুত ঘটনা। সব বর্ণনা করতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। দু'একটা নমুনা দিচ্ছি। দেখেছি একটা লোককে ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলল সবাই। আমরা সব দল বেঁধে দেখলাম, কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলাম না। দেখেছি—একদিন রাত্রে—একটি অর্ধ-উলঙ্গিনী মেয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল, তার পিছনে এল গুণ্ডা-গোছের লুঙ্গি-পরা লোক একটা, চুলের ঝুঁটি ধরে' টানতে টানতে নিয়ে গেল। একটা বাড়িতে চাকরি নিয়েছিলাম। কিছুদিন সেখানে দেখেছি বাড়ির কর্তা বাইরে হোটেলে রোজ ভাল-মন্দ খেয়ে আসেন, বাড়িতে স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা শাকচচ্চড়ি খায় রোজ। তিনি দামী-দামী টেরিলিনের স্যুট পরেন, হাতে সোনার ঘড়ি—স্ত্রী ছেলেমেয়েরা আধময়লা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে পরে। স্ত্রীর হাতে শাঁখা আর নোয়া ছাড়া কিছু নেই। ওর ঘড়িটা চুরি করে পালিয়েছিলাম আমি। আমি পেটের দায়ে ভিক্ষে করেছি, চুরি করেছি, ছ্যাঁচড়ামি করেছি—শেষে এক বুড়ি বেশ্যার লালসার খোরাকও জুগিয়েছি

কিছুদিন। এইসব আবর্তের মধ্যে কি করে জানি না আমার মনে এই ধারণাটা বসে গেছে যে ভারত-মাতা পালিয়ে গেছেন। মনে হচ্ছে খবরের কাগজে খুনের খবর আর বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার নারকীয় বর্বরতার খবরের কোন ফাঁকে এ খবরটাও যেন পড়েছিলাম ভারত-মাতা পালিয়ে গেছেন। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সেদিন মনে হচ্ছিল বিজ্ঞানীরা কোথায় যেন সূর্যকে নিয়ে ফুটবল খেলছেন। চাঁদকে কোন মাঠে নিয়ে গিয়ে চাঁদমারি করেছেন, মঙ্গলগ্রহ থেকে এক মহাবাঘ 'সসারে' চড়ে এসে নাকি পৃথিবীর নেতাদের ঘাড় মটকাচ্ছে—এই রকম নানা কথা মনে হয়। ভারত-মাতা পালিয়ে গেছেন এটাও হয়তো আমার আজগুবি কল্পনা।

পুলিশের তাড়া খেয়ে মাঝে মাঝে ছুটছিলাম। পয়সার লোভে বোমা ফেলেছিলাম এক জায়গায়। পুলিশের তাড়া খেয়ে ছুটছিলাম। কলকাতার বাইরে। হুগলী জেলার কি একটা গ্রাম যেন। নাম মনে নেই। অন্ধকার রাত্রি। সামনে কি আছে দেখতে পাচ্ছিলাম না ভালো। হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলাম একটা গর্তে। পায়ে কি একটা যেন বিঁধে গেল। তারপরই অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

" সকালবেলা যখন জ্ঞান হল—ক'দিন পরে হল জানি না—তখন অনুভব করলাম আমি প্রায় চলচ্ছক্তিহীন আর খুব ক্ষিধে পেয়েছে। পড়ে গিয়েছিলাম প্রকাণ্ড একটা ভাঙা নালির মধ্যে। আশপাশের সব ময়লা বোধহয় ওই নালিতে এসে জমে। কি বিকট দুর্গন্ধ। আমার গায়ের ছেঁড়া শার্ট আর পরণের প্যাণ্ট আগেই ময়লা হয়ে গিয়েছিল—দেখলাম নালির কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে সেগুলো। অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম পায়ের পাতাটা ফুলে পাউরুটির মতো হয়েছে। বেশ একটা বড় কাঁটা বিঁধে আছে। সেটা টেনে বার করে ফেললাম। রক্ত পড়তে লাগল।

অনেক দূরে দেখলাম একটা খোড়ো বাড়ি রয়েছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেইদিকেই এগুতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। হামাগুড়ি দিতে লাগলাম শেষে।

তারপর? না, ঠিক কতক্ষণ কেটেছে মনে নেই।

হঠাৎ অনুভব করলাম মুখে কে যেন জলের ঝাপটা দিচ্ছে।

জ্ঞান হল।

শুনলাম—"ফটিকদা, ফটিকদা—"

কে-ও?

তারপর হঠাৎ চিনতে পারলাম।

মল্লিকা। ওদের বাড়িতেই আমি আগুন দিয়েছিলাম। কিন্তু বললাম না যে চিনতে পেরেছি।

ফটিকদা, কি কষ্ট হচ্ছে তোমার?

বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে—

তাড়াতাড়ি গিয়ে দুধ নিয়ে এল খানিকটা। বুঝতে পারলাম ভারত-মাতা কোথাও যান নি।

আটকে গেল

অতুল নাগ সাধারণ ছেলে। বি. এ. পাশ। মা-বাবা ছেলেবেলায় গত হয়েছেন। মানুষ হয়েছে সে পিসির কাছে। পিসিও বিধবা। মহিয়সী মহিলা ইনি। দু'বার জেল খেটেছেন। লোকদেখানো পেশা ঝি-গিরি। কিন্তু আসলে ছিলেন তিনি চোরদের সাহায্যকারিণী। যে বাড়িতে চাকরি করতেন, সে বাড়ির সুলুক-সন্ধান জানিয়ে দিতেন চোরদের। কোন্ আলমারিতে গয়না থাকে, কোন্ বাক্সে টাকাকড়ি থাকে, এই সব খবর পাচার করে' বেশ রোজগার করতেন বিলু পিসি। নিঃসন্তান ছিলেন। সমস্ত স্নেহটা পড়েছিল অতুলের উপর। নায়গ্রা প্রপাতের মতো পড়েছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। পাঁচ বছর

বয়স্ পর্যন্ত অতুলকে কোলে নিয়ে বেড়াতেন। যে বাড়িতে কাজ করতে যেতেন, নিয়ে যেতেন অতুলকে। অতুলের জুতো জামা সোয়েটার প্যান্ট প্রভৃতির জৌলুষ অবাক করে' দিত সকলকে। ধনীর ছেলেদের মতই কাপড় জামা পরত সে। তার জন্যে আলাদা ভালো ভালো খাবারও কিনতেন বিলু পিসি। বিলু পিসির ঈর্ষা ছিল তাদের সম্বন্ধেই যারা ভদ্রলোক, যারা ফর্সা জামা কাপড় পরে' বেড়ায়, যারা হাকিম, ডাক্তার, উকিল, ইনজিনিয়ার, যারা মোটর চড়ে, যাদের বাড়িতে সে ঝি-গিরি করে। তাই বিলু পিসি চেয়েছিলেন তাঁর অতুলও ওদের মতো হোক। ছেলেবেলা থেকেই পোষাক-আসাকে তাই ভদ্র করে' তুলছিলেন তাকে। একটু বড় হতেই তাকে স্কুলে ভর্তি করে' দিলেন। পড়াবার জন্যে মাষ্টারও রাখলেন একজন। অতুল কিন্তু ছেলে ভালো ছিল না। স্কুলের মাষ্টাররা তার নাম দিয়েছিল গবেট, গবাকান্ত এই সব। কোন ক্লাস থেকেই সে একবারে প্রমোশন পায় নি। যে মাষ্টারটি ওকে বাড়িতে পড়াতে আসতেন, তিনি ওর বোকামির পাল্লায় পড়ে' নাকানি-চোবানি খেতেন রোজ। একদিন ধৈর্য হারিয়ে চড় মেরেছিলেন। অতুল সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাঁ করে গগন-বিদারী চীৎকার করতে লাগল। বিলু পিসি এসে পড়লেন। এসে দেখেন অতুল গাঁক্ গাঁক্ করে চেঁচাচ্ছে আর হাত পা ছুঁড়ছে।

'কি হল ?'

'মেরেছে। শালা মাষ্টার মেরেছে আমায়—' বিলু পিসি মাষ্টারকে বললেন—'ছেলেমানুষকে মেরেছ তুমি ? তোমাকে পড়া বলে' দেবার জন্যে রেখেছি, মারপিট করবার জন্যে তো রাখি নি।'

মাষ্টারমশাই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, 'আমি চললুম, ভস্মে আর ঘি ঢালতে পারব না।'

'কি বললে! ভস্ম ?'

চীৎকার করে উঠলো বিলু পিসি।

'মানিককে ভস্ম বললে তুমি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা—'

ঠিক এই সময় ময়দাবাবু প্রবেশ করলেন।

'কি হয়েছে, কি ব্যাপার!'

অতুল আরও জোরে কেঁদে উঠল। বিলু মাসি তার-স্বরে বিবৃত করলেন, কি হয়েছে।

ময়দাবাবু মাষ্টারের চুলের মুঠি ধরে' ঠাস ঠাস করে চড়িয়ে দিলেন।

'বেরিয়ে যা শ্লা। তোর মতন মাষ্টার অনেক পাব', জীর্ণ শীর্ণ মাষ্টারটি দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। ময়দাবাবু ষণ্ডা লোক। তাঁর আসল নাম চঞ্চলকুমার। একটা আটা-পেষাই কল আছে বলে' সবাই তাকে ময়দাবাবু বলে' ডাকে। গুজব উনি চোরেদের থানীদার একজন। অর্থাৎ চোরাই মাল লুকিয়ে রাখেন এবং পাচার করেন। বিলু মাসির সঙ্গে খুব দহরম মহরম। তাঁকেই বড় লোকদের বাড়ির অন্ধি সন্ধির খবর এনে দেন বিলু মাসি। দিয়ে বেশ মোটারকম টাকা পান। অতুলের জন্য আর একটি মাষ্টার এলেন। মাষ্টাররা আজকাল শিক্ষক নেই, কাক হয়ে গেছেন। ভাত ছড়ালেই এসে হাজির হন। এই সব কাকেদের শিক্ষায় যে শিক্ষা মেলে তার মূল মর্ম হল, আজকাল টাকায় সব হয়। ধরাধরি আর ঘুষ অসাধ্যসাধন করতে পারে। করছিলও। টপটপ করে' পরীক্ষা পাশ করছিল অতুল। হায়ার সেকেণ্ডারীতে ফার্ষ্ট ডিভিশনই পেয়ে গেল। যিনি গার্ড দিচ্ছিলেন তিনি তার খাতাটা বাইরে পাঠিয়ে একজন প্রফেসারকে দিয়ে টুকিয়ে আনলেন। বি. এ. পরীক্ষার সময় অবশ্য একটু কড়াক্কড়ি হয়েছিল। মিলিটারী পুলিশ পাহারা ছিল, কিন্তু তবু গার্ড-বেটা হাত সাফাই করতে পেরেছিল তার মধ্যেই। বি. এ. পাশ করেছিল অতুল। অতুলের বাইরের বাহারটাও কম ছিল না। দামী কাপড়ের চোং প্যাণ্ট, দামী হাওয়াই শার্ট, দামী চপ্পল, ইয়া জুলপি, ইয়া গোঁফ, মাথার পিছন দিকে শ্যাম্পু করা চুলের থোকা—সবই ছিল তার। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার মনে হল এক জায়গায় আটকে গেছি।

ব্যাপারটা কিন্তু সামান্য। সে দোকানে একদিন সিগারেট কিনছিল, এমন সময় দেখল পাশের দোকান থেকে ছট্টু একটা একসারসাইজ বুক কিনছে। ছট্টু তাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। এবার বি. এ. পরীক্ষা কমপ্লিট করেছে। পরনে সাধারণ একটা পাঞ্জাবী আর কাপড়। পায়ে চটি জুতো।

'এ কি ছট্টু এখানে যে—'

'এখানেই তো আমার বাড়ি।'

'কোথায়?'

'এই যে পাশের গলিতে। আসবে?'

অতুলের কৌতূহল হল। গেল তার সঙ্গে।

বাড়িতে ঢুকেই ছট্টু বলল—বস। মা, আমার কলেজের একজন বন্ধু এসেছে।

অতুল একটা সাধারণ তক্তাপোষে বসল। দেখল ঘরে কোনও জাঁকজমক নেই। কোণে একটা কাঠের টেবিল। তার সামনে একটা টিনের চেয়ার। দেওয়ালে কাঠের সেলফে মোটা মোটা বই। এটা ছট্টুর পড়ার ঘর বোধ হয়। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে হাসিমুখে মা এলেন। গায়ে সাদা ব্লাউজ, অতি সাধারণ শাড়ি পরণে। বললেন, 'খুব খুশী হয়েছি বাবা। একটু মিষ্টিমুখ করে' যাও। নারকেল নাড়ু করেছি—'

অতুলের মনে হল বিলু পিসি রগরগে রঙের ব্লাউজ পরে। শাড়িও ডগমগে। বাড়িতে খাবার করে না, কিনে আনে। হঠাৎ অতুলের মনে হল আমি কিছুতেই ছট্টু হ'তে পারব না। ওর আর আমার মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর, টাকা খরচ করে' তা পার হওয়া যাবে না। ছট্টু আর ছট্টুর মা তার সঙ্গে যত ভদ্রতা করতে লাগল ততই যেন দমে' যেতে লাগল অতুল। তার বার বার মনে হ'তে লাগল আমি হাজার চেষ্টা করলেও ছট্টু হ'তে পারব না। আমি হেরে গেছি।

হাবি আর নবু

রাস্তার ডাস্টবিন হাঁটকে বেড়ায় মেয়েটা। পরনে ময়লা ছেঁড়া কাপড়। মাথার চুল রুক্ষ। গায়েও তেল পড়েনি কতদিন তার ঠিক নেই। বয়স চোদ্দ-পনেরো হবে। বাপ-মা কেউ নেই। বাপকে সে দেখেও নি কখনও। শুনেছিল বাপ কোথা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। মা যতদিন বেঁচেছিল ততদিন ঝি-বৃত্তি করেছে। কিন্তু অনেক রোগ ছিল মায়ের। বিশেষ করে হাঁপানি। বেশী খাটতে পারত না। শেষে একদিন মরে গেল। পাড়ার ছেলেরাই চাঁদা করে মাকে শ্মশানে নিয়ে গেল। পাড়ার ছেলেদের মধ্যে মুরুব্বি হচ্ছে জিতু। ষণ্ডা গোছের মস্তান। তাকে এড়িয়ে চলত হাবি। সুযোগ পেলেই অশ্লীল কথা বলত, অশ্লীল ইঙ্গিত করত। পাড়ায় ঝি-গিরিও সে নেয় নি ওই জিতুর জ্বালায়। তার মা যে বাড়িতে কাজ করত সেই বাড়িতে সে গিয়েছিল অবশ্য। গিন্নীমাকে বলেছিল—আপনাদের বাড়িতে দিনরাত থাকব। কোনও মাইনে চাই না, আমাকে আর নবুকে খেতে দেবেন খালি। নবু তার চার বছরের ছোট ভাই। বাড়ির গিন্নী হাবির দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে বললেন—না বাছা, আমরা একটি বুড়িসুড়ি গোছের লোক চাই। হাবি যদিও নোংরা হয়ে থাকত কিন্তু তাকে ঘিরে অর্ধস্ফুট যৌবনের মহিমা বিকশিত হয়ে উঠেছিল। বাড়িতে অনেকগুলি সোমত্ত ছেলে, হাবিকে বহাল করতে সাহস পান নি দূরদর্শিনী গিন্নীমা। হাবি পাড়াতে আর কোথাও চেষ্টা করে নি। জিতুর ভয়ে। পাড়াতে থাকলেই জ্বালাতন করবে। তার মায়ের একটা সরু সোনার হার ছিল। সেইটে বিক্রি করে পঞ্চাশ টাকা যোগাড় করেছিল সে। তার থেকেই রোজ একখানা পাঁউরুটি কিনে সে নবুকে দিয়ে যেত। বলত—এটা খেয়ে থাকিস।

আমি বেরুচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে। রাস্তায় কোথাও বের হসনি যেন।

খুব ভোরে বেরিয়ে যেত হাবি। অন্ধকার থাকতেই। রাস্তার ভীড়ে হেঁটে বেড়াত আর ভিক্ষে করত। খুব ভোরে গঙ্গার ধারে গিয়ে হাত পাতলে কিছু পেত সে। কোনদিন চার আনা, কোনও দিন বা তারও বেশী। তারপর চলে যেত মাড়োয়ারি পট্টিতে। সেখানে একজন শেঠ রুটি বিতরণ করেন 'গরীব-দুখিয়া'দের। খানচারেক রুটি পেত। দুখানা খেত, দুখানা রেখে দিত নবুর জন্যে। তারপর যেখানেই বড় রকম ডাস্টবিন দেখত সেখানেই দাঁড়িয়ে হাঁটকে হাঁটকে দেখত যদি কিছু পাওয়া যায়। খাবার খুব কমই পাওয়া যেত। মাঝে মাঝে পাঁউরুটির টুকরো-টাকরা পেয়েছে। কিন্তু খাবার ছাড়াও ওখানে আরও নানারকম শৌখিন জিনিস পেয়েছে সে। ছোট্ট টিনের কৌটো, লেসের টুকরো, একটা ছেঁড়া ব্লাউজই পেয়েছিল একদিন। তাছাড়া টুকিটাকি নানারকম জিনিস, ছুরির বাঁট পেয়েছিল একদিন একটা। তার উপর খোদাই করা কুমীরের মুখ। ভারী চমৎকার দেখতে। আর একদিন স্নো-এর একটা ডিবে। তার ভিতর স্নো ছিল একটু। সেটা নিজের গালে মেখেছিল। একটা ফিতেও পেয়েছিল একদিন। নোংরা ডাস্টবিনে অনেক রকম জিনিস পাওয়া যায়।

বিকেলে কোন বড় রাস্তার চৌমাথায় গিয়ে দাঁড়ায় হাবি। মোটর দাঁড়ালেই সুর করে বলে—একটা পাঁচ নয়া বাবু। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। মিছে কথাও বলে—আমার বাবা মরে গেছে। মা অসুখে পড়ে আছে—দয়া করে কিছু দিন মা। কেউ দেয়, কেউ দেয় না। যারা দল বেঁধে মেয়ে দেখতে বেরোয় তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে চায়। হাবি মনে মনে ভাবে—বোকা পাঁঠার দল সব। মানুষ নয় ছাগল। প্যাণ্ট-পরা ছাগল। কিন্তু এসব ওর গা-সওয়া হয়ে গেছে। রাস্তায় বেরিয়ে ভিক্ষে যখন করতে হবে, ওদের দৃষ্টি এড়ানো যাবে না। দেখুক, মুখপোড়ারা যত খুশি দেখুক। দেখলে

গায়ে ফোসকা পড়বে না আমার। পথ চলতে চলতে নানারকম জিনিস দেখে হাবি। মোটরের সারি চলছে তো চলছেই। কতরকম লোক, কতরকম মুখ। মাঝে মাঝে পতাকা নিয়ে ছোঁড়ারা দল বেঁধে চেঁচাতে চেঁচাতে যায়। হাবি বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কি। একদিন মাড়োয়ারিদের বিয়ের প্রসেশন দেখেছিল। বর চলেছে ঘোড়ায় চড়ে। সামনে-পিছনে গড়ের মাঠের বাজনা। সারি সারি মোটর চলেছে। এসব দেখলে নবুর জন্যে মন কেমন করে তার। নবুটা কিচ্ছু দেখতে পায় না। গলির গলি তস্য গলির মধ্যে ছোট্ট ঘরে বসে থাকে বেচারা। তবু ভাগ্যে বাবা ওই ঘরটুকু করে গিয়েছিল তাই তো মাথা গোঁজবার একটা জায়গা পেয়েছে তারা। সামনে একটা দুর্গন্ধ নালি ভটভট করছে, দূরে একটা জলের কল, পাইপটা ভাঙা, দিনরাত জল পড়ছে তো পড়ছেই। সমস্ত গলিটা তাই স্যাঁতসেঁতে। প্রত্যেক বাড়ির নানারকম ময়লা এসে জমছে গলিটাতে। সর্বদাই একটা দুর্গন্ধ। অধিকাংশ বাড়িই খোলার। তাদের বাড়িটাও। তবু— হাবির মনে হয় ভাগ্যে ওই বাড়িটুকু আছে। নবুকেও কি শেষে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে? লেখাপড়া শেখার তো কোন উপায় নেই। দূরে একটা অবৈতনিক ইস্কুল আছে নাকি। কিন্তু সেখানেও নাকি মাস্টারদের পয়সা না দিলে ভর্তি করে না। ও আশা ছেড়েই দিয়েছে হাবি। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, ভালই হবে—ও আর একটু বড় হলে ওকে নিয়ে ভিক্ষেয় বেরুব। ওকেও ভিক্ষের বাঁধা গৎগুলো শিখিয়ে দেব। রাস্তায় রাস্তায় বড় হোক—যেমন কপাল করেছে। হাবির সবচেয়ে দুঃখ হয়, সে রাস্তায় কত রকম জিনিস দেখে—বাজি, ম্যাজিক, মোটরের সারি, কতরকম পোশাক—যদিও আজকাল বেশীর ভাগই চোং-প্যান্ট, তবু সেদিন একটা লম্বা জোব্বাপরা দাড়িতে মেহেদি-লাগানো লোক দেখেছিল, পার্কে পার্কে মিটিং হচ্ছে, গান বাজনা বক্তৃতার খই ফুটছে, টগবগ করছে যেন কলকাতা শহর। নবু বেচারা এসব কিছুই দেখতে পায় না। কি

যে নিয়ে যাবে তার জন্যে মাঝে মাঝে ভাবে হাবি। সেদিন ডাস্টবিন থেকে চমৎকার একটা নীল কাঁচের টুকরো কুড়িয়ে পেয়েছিল। সেটা চোখে দিয়ে দেখলে সারা পৃথিবীটা নীল হয়ে যায়। কি খুশিই হয়েছিল নবু। রোজ নবুর জন্যে একঠোঙা চানাচুর নিয়ে যায় সে। মাঝে মাঝে গরম জিলিপিও। একদিন একটা সোনালি কাঁচের চুড়ি পেয়েছিল। সেইটে এখনও পরে আছে নবু ডান হাতে। হাবি যত বলে—'তুই ব্যাটাছেলে তুই চুড়ি পরবি কি রে?' নবু তবু শোনে না। সেদিন হাবি ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। লোকে লোকারণ্য। প্রকাণ্ড একটা মিটিং হচ্ছে গড়ের মাঠে। মাইক ফিট করা চারিদিকে। হামদো-মুখো মোটা লোক একজন বক্তৃতা করছেন—আমাদের পণ, আমরা প্রত্যেকের মুখে পুষ্টিকর খাবার তুলে দেব, প্রত্যেকের কাপড়-জামার ব্যবস্থা করব, প্রত্যেকের ঘর-বাড়ি বানিয়ে দেব, সর্বহারারাই সব পাবে আবার, এদেশ কর্ণের দেশ, সত্যি জেলের ছেলে কর্ণই এবার মহারাজা কর্ণ হবে। এবার তাকে মহারাজা করবে দুর্যোধনের দল নয়, যুধিষ্ঠিরের দল, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে যাবে—

তারপর প্রচুর হাততালি। হাবি মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। আহা, সত্যি কি হবে অমন, ঠিক যেন রূপকথা। কোন কৌটোয় কোন ভোমরার ভিতর আছে সেই দুঃখরাক্ষসীর প্রাণ, সত্যি কি কোনও রাজপুত্র টিপে মারবে তাকে একদিন? তারপরই দুম দুম করে বোম ফাটল কয়েকটা। পালা, পালা, পালা—পুলিশও গুলি চালাচ্ছে। ছুটতে ছুটতে হাবি ঢুকে পড়ল একটা গলিতে। গলিটাও ছুটে হয়তো পার হয়ে যেত সে। হঠাৎ একটা ডাস্টবিন চোখে পড়ল তার। কানায় কানায় ভর্তি একেবারে। আর তার থেকে সাদা মতন লম্বা গোছের কি একটা বাক্স বেরিয়ে আছে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কি ওটা! তাড়াতাড়ি গিয়ে নিয়ে নিলে বাক্সটা। খুলে দেখলে। খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ দুটো। একেবারে খালি নয়। দুটো কাঠি আছে এখনও।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

গলির গলি তস্য গলিতে অন্ধকার আরও গাঢ়।

বড়রাস্তার আলোও নিভে গেছে। এ তল্লাটেই ইলেকট্রিক বন্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ। হাবির গলিতে অবশ্য ইলেকট্রিসিটি নেই। নির্বিঘ্নে ফিরে এল হাবি রাত্রি ন'টা নাগাত।

নবু—নবু—কপাট খোল—

নবু চিন্তিত হয়ে বসেছিল। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাছে বেশী তেল খরচ হয়ে যায় তাই সে প্রদীপও জ্বালায় নি। তাড়াতাড়ি উঠে কপাট খুলে দিলে সে।

'এ কি রে! অন্ধকারে বসে আছিস! পিদিমটা জ্বালিস নি এখনও? তাড়াতাড়ি জ্বাল। আজ একটা মজার জিনিস পেয়েছি—'

'কি—'

'আলোটা জ্বাল না আগে—'

প্রদীপের আলোটা জ্বলতেই হাবি বাক্সটা তার হাতে দিল—'বার কর।'

'কাঠির মত কি এটা—'

'এইখানটা ধর—আর ওই দিকটা পিদিমের আগুনের উপর ধর। দেখ না কি কাণ্ড হয়—'

সঙ্গে সঙ্গে ফুলঝুরিতে আগুন ধরে গেল।

অসংখ্য তারার ফুল ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

'বাঃ, ভারি সুন্দর তো। এ কি জিনিস দিদি—'

'এর নাম ফুলঝুরি। তুই হবার আগে মা আমাকে কিনে দিয়েছিল একবার কালীপুজোর সময়।'

'বাঃ, ভারি চমৎকার। আর নেই?'

'আর একটা কাঠি আছে। ওটা কাল পোড়াস। সব কি একদিনে শেষ করতে আছে?'

মুগুর

'স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে আমাদের সাধারণ লোকের দুর্গতির আর অন্ত নেই। রাস্তা চারদিকে খোঁড়া, এক পশলা বৃষ্টি হলে চারদিক জলে জলময়। ইলেকট্রিক আলো বার বার নিভছে। বাধ্য হয়ে সাবেক লণ্ঠন চালু করেছি। হাতপাখাও কিনেছি খান কয়েক। যথাসর্বস্ব খরচ করে ছেলেমেয়েদের কলেজে পড়িয়েছিলাম। ছেলে চাকরি পায় নি, মেয়ে রূপসী নয় বলে বিয়ে হয় নি। তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে ইণ্টারভিউ দিচ্ছে। শুনছি ঘুস না দিলে চাকরি হবে না। মাছ-মাংস খাওয়া ভুলে গেছি। শাকপাতাই খাই। ডিম আলু কালে-ভদ্রে। এ স্বাধীনতা যদি আরো কিছুদিন চলে তাহলে হয়তো শাকপাতাও জুটবে না। রেশনের চাল তো আর খাওয়া যায় না ভাই। ওরকম চাল যে ওরা কোথায় পায় ভগবানই জানে। পচা চাল—রাঁধবার সময় দুর্গন্ধ ছাড়ে। আর সবচেয়ে মুশকিলে পড়েছি আমার ছোটছেলের জ্বরটা ছাড়ছে না। যে ডাক্তার বাবু দেখেছিলেন তিনি বললেন টাইফয়েড হয়েছে। টাইফয়েডের ওষুধ লিখে দিলেন। ধার করে আকাশছোঁয়া দাম দিয়ে সে ওষুধ কিনে আনলাম তবু সারছে না। ডাক্তারবাবু সন্দেহ করছেন ওষুধে ভেজাল আছে। তিনি আর একটা ওষুধ লিখে দিয়েছেন আর একটা বিশেষ দোকান থেকে কিনতে বলেছেন। তারা কিন্তু যা দাম চাইছে তা আমার সাধ্যাতীত। এখন তাই ভাবছি আমার মা-ঠাকুমা যা করতেন তাই করব। বাবা তারকেশ্বরের কাছে গিয়ে ধর্ণা দেব।'

বলে যাচ্ছিলেন শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরখেল ওরফে পচাবাবু, আর শুনছিলেন রামগুরু পাঠক ওরফে মুগুর। শৈশবে ও কৈশোরে রামগুরুর সঙ্গে পঞ্চানন একসঙ্গে পড়েছিলেন কানপুরের এক স্কুলে।

তারপর রামগুরু কলকাতাতেই এসে ব্যবসা করেছিলেন। রামগুরু যদিও উত্তরপ্রদেশবাসী কিন্তু বাংলা ভাল বলে। উর্দু এবং হিন্দী তো গড় গড় করে বলতে পারেই। বহুকাল পরে দুই বন্ধুর দেখা হয়েছে।

সব শুনে রামগুরু বললে—'তুমি বাবা তারকেশ্বরের কাছে যাও। প্রেসকৃপশনটা দিয়ে যাও আমাকে—।'

'ভাই অত দাম দিয়ে আমি ওষুধ কিনতে পারব না।'

'দাম তোমাকে দিতে হবে না।'

'তুমি দেবে? না, তাও আমি চাই না।'

রামগুরু হিন্দীতে বলে উঠল—'আরে দেও না ভাই। কাহে হাল্লা মাচাতে হো—।'

রামগুরুর গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। বেশ বলিষ্ঠ লোক।

অনেকদিন পরে দেখা তার সঙ্গে। তাকে চটাবে সাহস হল না পচাবাবুর।

প্রেসকৃপশনটা দিয়ে দিলেন তাকে।

তারপর বললেন, 'তুই আজকাল কি করিস, কোথায় থাকিস?'

রামগুরু ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলল—'স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে থাকি। আমি এখন চললাম। তুই বাবা তারকেশ্বরের কাছে যা। পরে পারি তো দেখা করব তোর সঙ্গে।'

রামগুরু স্বল্পভাষী লোক। 'তাহলে চললুম'—বলে চলে গেলেন। পচাবাবু বাড়ির ভিতর গিয়ে দেখলেন ছেলে চোখ বুজে আছে। ডাকলে সাড়া দিচ্ছে না। শুনলেন—জ্বর ১০৫ ডিগ্রি। মাথায় জলপটি দিয়ে স্ত্রী ব্যাকুলভাবে হাওয়া করে চলেছেন। বড়ছেলে, বড়মেয়ে কেউ বাড়ি নেই। দু'জনে চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে গেছে। পঞ্চানন স্ত্রীকে বললে—আমাকে গোটা পনেরো টাকা বার করে দাও। আমি বাবা তারকেশ্বরের কাছে যাব। ধর্ণা দেব। বাবার দয়া না হওয়া পর্যন্ত ফিরব না।'

সে কি !

আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন তাঁর স্ত্রী। কিন্তু স্বামীকে নিরস্ত করতে পারলেন না। তিনি সমস্ত স্থির করে ফেলেছিলেন। চলে গেলেন তিনি। পথে দেখা হল তাঁর আর এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে। একই আপিসে চাকরি করতেন দু'জনেই।

'পঞ্চানন বাবু, কি খবর ?

'খবর এখনও মরে যাই নি। মর-মর হয়েছি। আপিসের পেন্সন আনতে পারি নি এখনও। বার কুড়ি গেছি। ছেলে-মেয়ের চাকরি হয় নি এখনও। অথচ ওদের চেয়ে অনেক খারাপ ছেলে-মেয়ের চাকরি হয়ে গেল মুরুব্বির জোরে।'

'আপনার ছেলে-মেয়ের মুরুব্বি নেই—?'

'আছেন একজন এম. এল. এ.।'

'শুধু এম. এল. এ. হবে না, মন্ত্রী চাই। আর এ গভর্নমেণ্ট বোধহয় টিকবেও না। সবাই মন্ত্রী হতে চায়। তা কি সম্ভব।'

মুচকি হেসে ট্রাম থেকে নেমে গেলেন ভদ্রলোক। পঞ্চানন হাওড়ায় পৌঁছে শেষ বিড়িটি ধরিয়ে তারকেশ্বরের ট্রেনে উঠলেন।

॥ দুই ॥

তারকেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করে পাণ্ডার হাত থেকে ফুল-বেলপাতার আশীর্বাদ নিয়ে শুয়ে পড়লেন পঞ্চানন মন্দিরের চত্বরে।

যতক্ষণ বাবা দয়া না করেন ততক্ষণ জলস্পর্শ করবেন না তিনি—মনে মনে এই শপথ করে চোখ বুজে শুয়ে রইলেন চুপ করে। প্রথম দিন প্রথম রাত কেটে গেল, কিছু হল না। দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় রাতও কাটল, কিছু হল না। তৃতীয় দিনও দিনের বেলা কিছু হল না, কিন্তু গভীর রাত্রে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি। দেখলেন স্বয়ং মহাদেব যেন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, বাবা পচা, তোমার উপর

সন্তুষ্ট হয়েছি আমি। তুমি বাড়ি গিয়ে দেখবে তোমার ছেলের ওষুধ এসে গেছে, ওষুধ খেয়ে জ্বরও অনেক কমে গেছে, জ্ঞান হয়েছে। ওই ওষুধেই সে ভাল হয়ে যাবে। তোমার ছেলে-মেয়ের চাকরিও হবে। কিন্তু এখনও একটু দেরী আছে। তোমার মুরুব্বি এম. এল. এ.-টি যখন মন্ত্রী হবেন তখন চাকরি পাবে ওরা। ভবিষ্যতে সব এম. এল. এ.-ই মন্ত্রী হবে। প্রত্যেককে মন্ত্রী না করলে এদেশে গণতন্ত্রকে টেকানো যাবে না। অনেক পোর্টফোলিও হবে—পানের পোর্টফোলিও, চুনের পোর্টফোলিও, সুপুরির পোর্টফোলিও, খয়েরের পোর্টফোলিও, বিড়ির পোর্টফোলিও, তামাকের পোর্টফোলিও, সিদ্ধির পোর্টফোলিও, গাঁজার পোর্টফোলিও—আমাদের যতরকম প্রয়োজনীয় জিনিস আছে প্রত্যেকটির জন্য আলাদা পোর্টফোলিও হবে আর প্রত্যেকটির জন্যে মন্ত্রী থাকবে। তোমরা যখন পরাধীন ছিলে তখন একটা সাহেবই সব চালাত—কিন্তু এখন তা তো হতে পারে না—স্বাধীন দেশে ঝাঁক ঝাঁক মন্ত্রী আর লাখ লাখ পোর্টফোলিও চাই—।

পঞ্চাননের ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল বাবাকে জিজ্ঞেস করলে হত অত মন্ত্রী হলে তাদের মাইনে হবে কত? সঙ্গে সঙ্গে তার কানে কানে কে যেন বলে গেল—পঞ্চাশ টাকা করে। ওতেই ওরা রাজী হবে।

॥ তিন ॥

বাড়ি ফিরে অবাক হয়ে গেলেন পঞ্চানন।

তার স্ত্রী বললেন—'তুমি, চলে যাওয়ার খানিকক্ষণ পরে একটি ষণ্ডা গোছের লোক এসে হাজির হল। ওষুধ দিয়ে গেল। আর দিয়ে গেল একবস্তা গোবিন্দভোগ চাল আর প্রকাণ্ড রুইমাছ একটা। ডাক্তারবাবুর কাছে ওষুধগুলো নিয়ে গেলাম। ডাক্তারবাবু বললেন—'হ্যাঁ এই ওষুধই তো লিখে দিয়েছিলাম। খাওয়ান ওটা।' খাইয়ে খোকা বেশ ভাল আছে। কি ব্যাপার?'

পঞ্চানন বলল—'আমার বন্ধু মুগুর এসেছিল। তাকে বলেছিলাম সব   সে-ই বোধহয় ব্যবস্থা করেছে—'

'পচা ফিরেছিস্ ?'

বাইরে মুগুরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

পঞ্চানন বেরিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি।

'খোকা কেমন আছে ?'

'ভাল আছে। ওষুধটার অনেক দাম নিয়েছে, না ?'

'অনেক দাম চেয়েছিল। আমি বললাম—দিন, দাম দিচ্ছি। তারপর ওষুধটি পকেটস্থ করে নাকে ঝেড়ে দিলাম এক ঘুসি। বললাম শালা ব্ল্যাক করবার আর জায়গা পাও নি! হৈ হৈ উঠল একটা, আমি তার মধ্যেই ডুবকি মেরে দিলাম।'

'চাল আর মাছ ?'

'ওরা আমার বাধ্য লোক! ওদের আমরা রক্ষা করি। আমরা না থাকলে ওদের গুদোম ওদের ভেড়ী লুট হয়ে যেত। আমরাই বাঁচাই ওদের। তাই ওরা আমাদের খাতির করে, ভয়ও করে, যখন যা চাই দেয়। ভাই রে, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি। সোজা আঙুলে কোন ঘি-ই বেরোয় না এখানে। বার বার আঙুল বেঁকাতে হয়। যাই হোক, তোর কোন ভাবনা নেই। আমি আসব মাঝে মাঝে, তুই পুরনো দোস্ত, সব ঠিক করে দেব তোর।'

'আচ্ছা, তুই কি করিস বল তো ?'

'বলেছি তো আমি স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ। কেউ বলে মস্তান, কেউ বলে গুণ্ডা—'

হা হা করে হেসে উঠল মুগুর।

অসমাপ্ত গল্প

অনেকক্ষণ ধরে কল্পনাকে ডাকছিলাম। অনেক ডাকাডাকির পর তবে তিনি এলেন।

'কি চান, আমাকে ডাকছেন কেন?'

'দয়া করে গল্পের একটা প্লট দিন আমাকে।'

'আমার কাছে আজকাল গল্পের প্লট তো কেউই চায় না। গল্পের প্লট তো রাশি রাশি ছড়ানো রয়েছে চারিদিকে। তার থেকেই কোন একটা বেছে নিয়ে লিখে ফেলুন। বাস্তব গল্পই তো লোক আজকাল চায়।'

কি রকম প্লট?'

'একটি মেয়ে তার স্বামীকে ছেড়ে চলে' গেছে, একটি ছেলে তার বুড়ো বাপকে জুতো মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, একটা বেকার আত্মহত্যা করেছে, আর একজন চুরি করেছে, ছাত্ররা শিক্ষকদের উপর হামলা করছে, পরীক্ষা দিতে বসে' নকল করছে আর বলছে বেশ করছি, খুব করছি, আরও কবব। বাজারে জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য কিন্তু খদ্দেরের ভীড়ও কম নয়, একটু দেরি করে' গেলে পনেরো টাকা কে. জি. দরেব মাছও পাওয়া যায় না। এই সব কোন একটা নিয়ে লিখুন না। ঠাকুরমার রূপকথা বা আরব্য উপন্যাসের গল্প আজকাল চলবে কি? আমি যে প্লট দেব আপনাকে, তা ওই রকমই আজগুবি হবে কিছু একটা। বাজারে চলবে না। আপনি আলু বিক্রি করতে চান তো?'

'হ্যাঁ—'

'তাহলে বিলিতি ডিটেকটিভ গল্প বা পর্ণোগ্রাফী থেকে চুরি করতেও পারেন। খুব কাটবে—'

'না, না—আপনি কিছু একটা বলুন—'

'মুশকিলে ফেললেন দেখছি। আচ্ছা, একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ের কথা আমার মনে হয়েছিল সেদিন। তার নাম দিয়েছিলাম সারেগামা। আশ্চর্য মেয়ে। তার সঙ্গে ফুলের উপমা দেব, না জ্যোৎস্নার উপমা দেব, না ভোরের সোনালি আলোর উপমা দেব তা ভেবে পাচ্ছি না। তার এক অঙ্গে যেন বিশ্বের সব রূপ ঝলমল করছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানেন? মেয়েটি যা বলত তা সুরে বলত। ভোরবেলা খাবার চাইত ভৈরবী সুরে গান গেয়ে। দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ রোদের দিকে চেয়ে সারং ভাঁজত, বিকেলে বন্ধুদের ডাক দিত ইমন সুরে, রাত্রে শুতে গিয়ে ঝিকে মশারি ফেলে দিতে বলত কখনও বেহাগে, কখনও বাগেশ্রীতে। চারদিকে কিন্তু সবাই বেসুরো। মুশকিলে পড়ে গেল সারেগামা। সবাই মনে করতে লাগল মেয়েটা পাগল। বিয়ের বয়স হল, কিন্তু পাত্র জুটল না। তার বাবা মা ব্যস্ত হয়ে উঠল। বদ্যি ডাকল। বদ্যি বললে—এ মেয়ে পাগল নয়। এ মেয়ে অসাধারণ। বাবা-মার মনে হল আমরা সাধারণ লোক। আমরা অসাধারণ মেয়ে নিয়ে কি করব। সারেগামাই সমস্যার সমাধান করে দিলে একদিন। গভীররাত্রে ছাতের উপর উঠে আকাশের তারাদের দিকে চেয়ে চেয়ে সে অদ্ভুত একটা সুর ভাঁজতে লাগল। সে সুর কোনও চেনা সুর নয়—তা তার প্রাণের সুর। আকাশের তারারা কাঁপতে লাগল। তারপর আকাশ থেকে—'

এমন সময় পিওন একটা চিঠি দিয়ে গেল।

চিঠিটা পড়ে উল্লসিত হয়ে উঠলাম।

বললাম—'এখন গল্প থাক। আমাকে এক্ষুণি বেরুতে হবে।

'কেন—'

'চাকরির জন্য একটা দরখাস্ত করেছিলাম। পেয়ে গেছি। এখুনি যেতে হবে'

ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেলাম।

ঝুমরি

উদীয়মান ঐতিহাসিক লেখক অম্বিকানাথ লেখক হিসাবে প্রথম শ্রেণীর, কিন্তু তাঁহার লেখা সুলভ নহে। কারণ তিনি ফরমাশে লেখেন না, টাকার লোভেও লেখেন না। লেখেন কম। খেয়ালী লোক, মেজাজ ঠিক না থাকিলে লেখার টেবিলে বসেন না। বিবাহ করেন নাই, সংসারে আত্মীয়-স্বজনও কেউ নাই। বিরাট তিনতলা বাড়িতে তিনি একাই থাকেন। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র। ব্যাংকে প্রচুর টাকা, জমি-জমাও অনেক। অর্থাভাব নাই। ইচ্ছা করিলে নানারূপ বিলাসে গা ভাসাইতে পারিতেন, দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিবার সামর্থ্যও তাঁহার ছিল। কিন্তু সে-সব দিকে প্রবৃত্তি ছিল না। পারতপক্ষে বাড়ির বাহিরে যাইতেন না। একটু কুনো প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনতলায় ছিল তাঁহার বড় বড় চারখানি ঘর। চারখানি ঘরই বইয়ে ঠাসা। একটিতে শুইবার জন্য একটি খাট, আর একটিতে লিখিবার জন্য চেয়ার-টেবিল। আর সামনে ছিল প্রশস্ত একটা বড় ছাত। ছাতে সারি-সারি গোলাপ ফুলের টব এবং জুঁই-মালতীর লতা। এই পরিবেশ ছাড়িয়া অম্বিকানাথ কোথাও গিয়া স্বস্তি পাইতেন না। বাহির হইতে কোন লোক আসিলেও তিনি অস্বস্তি বোধ করিতেন। বাহিরের লোক ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য নীচে ঝুমরি থাকিত। ঝুমরি অনুমতি না দিলে অম্বিকাবাবুর সহিত দেখা করা সম্ভব ছিল না।

শুনিয়াছিলাম অম্বিকাবাবু নাকি ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুফীদের লইয়া একটি ভাল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। আমার মাসিক পত্রিকাটির জন্য সেই প্রবন্ধটি সংগ্রহ করিবার বাসনা হইল। অম্বিকাবাবুকে একটি পত্র দিলাম। তিনি উত্তরে জানাইলেন, প্রবন্ধ লেখা এখনও সম্পূর্ণ

হয় নাই, আপনি একমাস পরে আসিয়া আমার সহিত দেখা করুন। যে মাসিকপত্রে প্রবন্ধটি প্রকাশ করিতে চান তাহার নমুনাও সঙ্গে আনিবেন।

একমাস পরে তাঁহার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। প্রকাণ্ড হাতা-ওয়ালা বাড়ি। হাতার চারিদিকে উঁচু দেওয়াল। গেটে কেহ ছিল না। গেটের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি চারিদিকে ভুট্টা-ক্ষেত। আমি প্রবেশ করিতেই ভুট্টা-ক্ষেতের ভিতর হইতে একটি প্রৌঢ়া সাঁওতালনী বাহির হইয়া আসিল। কালো রং, তাম্রের মত মুখ, হস্তীমুণ্ডের মত নিতম্ব, সমুন্নত পয়োধর, হাতে একটি লাঠি।

'তুই কে বটিস্?'

'আমি অম্বিকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। ঝুমরি কোথায় থাকে—'

'আমিই ঝুমরি। ছেল্যার শরীর ভাল লয়। দেখা হবেক নাই।'

'কবে আসব?'

'আসিস না। তুরা সবাই উয়ার মাথাটা খারাপ করে দিবি। সারাদিন সারারাত খালি পড়ে। ঘুমোয় না। তুরা আসিস না—'

সবিনয়ে বলিলাম—'আমার বড় দরকার। উনিই আমাকে ডেকেছেন।'

'সাতদিন পরে আসিস।'

সাতদিন পরে আবার গেলাম। আবার ঝুমরি ভুট্টা-ক্ষেত হইতে বাহির হইল। এবার সে বাধা দিল না। এবার অম্বিকা-বাবুর সহিত দেখা হইল। দেখিলাম তিনি বেহালা বাজাইতেছেন। আমি চেয়ারে বসিয়া রহিলাম, তিনি বেহালা বাজাইতে লাগিলেন। বেহালা বাজানো শেষ করিয়া বলিলেন—'কে আপনি।'

'আমার নাম বসন্ত সেন। আমি আপনার সেই সুফী-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে প্রবন্ধটার জন্যে এসেছি—'

'আপনার তো সাতদিন আগে আসবার কথা।'

'আমি সাতদিন আগেই এসেছিলাম। কিন্তু শুনলাম আপনার শরীর খারাপ। ঝুমরি বললেন সাতদিন পরে আসতে।'

অম্বিকা একটু হাসিলেন।

বলিলেন—'ঝুমরি সহজে কাউকে আমার কাছে আসতে দেয় না। কই দেখি আপনার পত্রিকাটি কি রকম?'

পত্রিকাটি দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। আর্ট-পেপারে ছাপা, ছাপার ভুল নাই, ছবিগুলিও সুন্দর।

বলিলেন—'বেশ আপনাকে প্রবন্ধটা দেব।' পারিশ্রমিক কত লইবেন তাহা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না। তিনিও কিছু বলিলেন না। কিন্তু আমি একটি লোভনীয় টোপ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। সেইটি ফেলিলাম।

'আমি কিছু হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি পেয়েছি। সেটার পাঠোদ্ধার করবার সামর্থ্য আমাদের নেই। আপনি যদি—'

অম্বিকাবাবু আমাকে কথা শেষ করিতে দিলেন না।

'হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি? নিশ্চয় আনবেন। পাঠোদ্ধার করবার চেষ্টা করব। যদি পারি প্রবন্ধও লিখব এ নিয়ে। আপনি নিয়ে আসবেন।'

সসঙ্কোচে বলিলাম—'কিন্তু আপনার ঝুমরি কি আমাকে আসতে দেবে? আপনি যদি ওকে বলে দেন ভালো হয়। ও আপনার চাকরানী তো—'

'আরে না, না—ও আমার মা।'

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন অম্বিকাবাবু।

'কি রকম? আপনার মা?'

'বছর পাঁচেক আগে ওকে বাহাল করেছিলাম। বাহাল করবার কিছুদিন পরে লক্ষ্য করলাম, ও কেবল আমার চারদিকেই ঘুর ঘুর করে। একদিন মশারীর ভিতর শুয়ে আছি, ও দেখি মশারীর ভিতর ঢুকে পড়েছে—বললাম, কিরে এখানে ঢুকছিস কেন? ও বলল

দেওয়ালের দিকের মশারীটা ভাল করে গোঁজা হয় নি, তাই গুঁজে দিচ্ছি। ভারি রাগ হল। বকলাম খুব। জিগ্যেস করলাম—তুই আমার কাছে কাছে ঘুর ঘুর করিস কেন? কাঁদতে লাগল। তারপর কি বলল জানেন—আমার যে ছেলেটা মরে গেছে তোর মুখ যেন তারই মতো। আমি তাকেই দেখি তোর মধ্যে। তাই তোর কাছে ঘুর ঘুর করি। তখন আমি বললাম তুই তাহলে চাকরানী হয়ে থাকবি কেন? আমার মা হ। আমার সব ভার নে। ও জবাব দিলে—হুঁ নিব। সেইদিন থেকে ও আমার মা হয়েছে, সর্বদা আমাকে আগলে আগলে বেড়ায়। আমাকে চান করিয়ে দেয়, আমার চুল আঁচড়ে দেয়, আমার জন্যে রান্না করে। রাত দশটার পর আমার পড়ার ঘরের আলো নিবিয়ে দেয়। মানা করতে গেলে মাথা খুঁড়তে থাকে। She is a tigress.'

আমি অম্বিকাবাবুকে হাতে-লেখা পুঁথিগুলি পৌঁছাইয়া দিতে পারিয়াছিলাম। অম্বিকাবাবু বলিয়াছিলেন একমাস পরে যাইতে। একমাস পরে গিয়াছিলাম, কিন্তু গেট পার হইতে পারি নাই। আমাকে দেখিয়া ঝুমরি রামদা লইয়া ছুটিয়া আসিল।

'বেরা, বেরা এখান থেকে। কি কতকগুলান ছাই-পাঁশ দিয়ে গেলি সেদিন। সেই থেকে ছেল্যাটার ঘুম নাই, খেতেও চায় না। আমার একটা ছেল্যা মরে গেছে, এটাকেও মারবি নাকি তুরা। বেরা এখান থেকে। কারুকে ঢুকতে দিব নাই আমি। বেরা, বেরা,' রামদা উঁচাইয়া তাড়া করিয়া আসিল আমাকে। চলিয়া আসিতে হইল। কয়েকদিন পরে অম্বিকাবাবুর পত্র পাইলাম।

সবিনয় নিবেদন

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আপনাদের পাণ্ডুলিপি কাল ঝুমরি পুড়াইয়া ফেলিয়াছে। পাগলীকে লইয়া কি যে করিব বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। নমস্কার। ইতি অম্বিকানাথ।

ভুলির গল্প

আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই খুব গরীব। ভুলির স্বামী যোগেশ আরও গরীব ছিল। যোগেশ জমিদারবাবুদের বাড়িতে মালীর কাজ করিত। তাহার বাবা মা আত্মীয় স্বজন বড় একটা ছিল না। প্রথম যৌবনে, মানে কুড়ি বৎসর বয়সে, বিবাহ হইয়াছিল দুর্গার সহিত। এক বৎসর পরে দুর্গা কলেরায় মারা গেল। তাহার পর যোগেশ আর বিবাহ করে নাই। নানা জায়গায় নানা কাজ করিয়াছে সে। ক্ষেত-মজুরের কাজই বেশী করিত। গাছপালাকে ভালবাসিত, তাদের সেবা করিয়া আনন্দ পাইত। তাহার বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন জমিদারবাবুর বাগানে মালীর কাজে বহাল হইল সে। সেই সময়ে বাগানের মধ্যে থাকিবার জন্য একটি ঘর পাইয়াছিল। জমিদারবাবুই বলিলেন, তুই আবার বিয়ে কর। তিনি নিজেই উদ্যোগী হইয়া পাত্রী ঠিক করিলেন পাশের গাঁয়ের ভুলিকে। পিতৃ-মাতৃহীনা ভুলি তাহার দূর সম্পর্কের মাসীর বাড়িতে অসীম লাঞ্ছনা দুর্গতির মধ্যে মানুষ হইতেছিল। জমিদার পলাশলোচন তাহাকে সেখান হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া যোগেশের বধূ করিয়া দিলেন। প্রৌঢ় যোগেশ এই নবোদ্ভিন্নযৌবনা বধূটিকে লইয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। ভুলি শুধু নবোদ্ভিন্নযৌবনা নহে সে রূপসীও। তাহাকে দেখিলে মুনির মনও টলিয়া যাইবার সম্ভাবনা—এই রমণীরত্নকে লইয়া যোগেশ কি করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

ভুলি কিন্তু অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে। সে লেখাপড়া শেখে নাই। আধুনিকতার ধার ধারে না। তাহার বদ্ধ ধারণা এবং অটুট বিশ্বাস, পতি পরম গুরু, পতি দেবতা। যদিও যোগেশের দেবতা-সুলভ গুণ-রাশি ছিল না, সে ঘন ঘন বিড়ি খাইত, দুর্মুখ ছিল, গোপনে বাগান

হইতে ফুল ও ফুলগাছের চারা বিক্রয় করিয়া অসদুপায়ে মাঝে মাঝে কিছু উপরি রোজগার করিত। ভুলিকে মাঝে মাঝে চুলের ঝুঁটি ধরিয়া চড়-চাপড় দিত, তবু কিন্তু ভুলির ধারণা বদলায় নাই। সে বিশ্বাস করিত যোগেশ তাহার পরম গুরু, যোগেশই তাহার জীবনে একমাত্র দেবতা।

পলাশলোচন কিন্তু নিগূঢ় অভিসন্ধি লইয়াই যোগেশের সহিত ভুলির বিবাহ দিয়াছিলেন।

পলাশলোচন যখন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন তখন মাঝে মাঝে তিনি ছিন্নবসন পরিহিতা ভুলিকে পথে গোবর কুড়াইতে দেখিতেন। খোঁজ খবর লইয়া যখন তিনি জানিতে পারিলেন ভুলি যোগেশের পালটি ঘর, তখন তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনিবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন তিনি। ভাবিলেন তাহাকে যদি নিজের বাগান-বাড়িতে আনিতে পারেন তাহা হইলে আর বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। গরীবের মেয়ে তো। অর্থলোভে সহজে ভুলিয়া যাইবে। ভুলি কিন্তু ভুলিল না। বাগানে আসিয়াই সে পলাশলোচনেব ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল বাবুটি ভাল নয়। একটি অদৃশ্য বর্মে নিজেকে আবৃত করিয়া বাগানবাড়িতে বাস করিতেছিল সে। স্বামীকে সে কিছু বলে নাই। তাহার মনে হইয়াছিল এ কথা বলিলে সে হয়তো চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু এ রকম একটি ভাল চাকরি ছাড়িয়া যাইবেই বা কোথা? এমন চাকরি পাওয়াও সহজ নয়। ভুলি ভাবিয়াছিল নিজেই সে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না।

পলাশলোচন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। প্রথমত তিনি ভুলিকে নিজের খাস কামরার দাসীরূপে বাহাল করিতে চাহিলেন। ভুলি রাজী হইল না। পলাশলোচন তাহার পর তাহাকে টাকার লোভ দেখাইতে লাগিলেন। টাকার অঙ্ক দশ হইতে শুরু হইয়া এক শত পর্যন্ত হইল। তবু ভুলিকে বাগে আনা গেল না। পলাশলোচন তখন আর একটি

কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি যোগেশকে দেওঘর পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, তুমি সেখানে গিয়া নিজে দেখিয়া এক শত ভাল গোলাপের চারা কিনিয়া আনো। যোগেশ যেদিন চলিয়া গেল সেই দিন রাত্রেই পলাশলোচন ভুলির ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভুলি সঙ্গে সঙ্গে খিড়কির দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া গেল এবং ক্রমাগত ছুটিতে লাগিল। তাহার কাতর হৃদয় মথিত করিয়া যে নীরব প্রার্থনা ভগবচ্চরণে আছড়াইয়া পড়িতেছিল তাহারই ফলে পরবর্তী ঘটনাটি ঘটিল কিনা জানি না কিন্তু ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা সত্যই অদ্ভুত। আমাদের টি-ভি দেখিয়া অদ্ভুত মনে হয় না, লণ্ডনের কাহাকেও কেবল্ করিয়া তাহার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা আমাদের নিকট আশ্চর্য মনে হয় না, রেডিও শুনিয়া আমরা বিস্ময়বোধ করি না কিন্তু ইহার পর ভুলির অদৃষ্টে যাহা ঘটিল তাহা শুনিয়া আপনারা অবিশ্বাসের হাসি হাসিবেন।

ভুলি ক্রমাগত ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে একটি জঙ্গলে গিয়া ঢুকিয়া পড়িল। জঙ্গলের ভিতর কিছু দূর ঢুকিয়া ভুলি দেখিতে পাইল প্রকাণ্ড একটি গাছ দাঁড়াইয়া আছে। ভুলি গাছটির ওপাশে গিয়া গাছটিতে ঠেস দিয়া বসিল। ঠেস দিবামাত্র অন্তর্হিত হইল গাছটি। একজন দিব্যকান্তি যুবা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। শুধু দাঁড়াইল না তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'মা, আদেশ করুন, কিভাবে আপনার সেবা করব।'

ভুলি সভয়ে প্রশ্ন করিল, 'তুমি কে বাবা?' যুবক বলিল, 'আমি নাগরাজ ফণীন্দ্র। দেবতার অভিশাপে গাছ হয়ে ছিলাম এতদিন। দেবতা বলেছিলেন কোন সতী রমণী যদি তোমাকে স্পর্শ করে তাহলেই তুমি মুক্তি পাবে। আপনার স্পর্শে আজ আমি মুক্তি পেয়েছি, আপনি দেবী। আমি আপনার ভৃত্য, যা বলবেন তাই করব।'

ভুলি তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিল। ফণীন্দ্র নিমেষের মধ্যে নিজেকে শঙ্খচূড় সর্পে রূপান্তরিত করিয়া বলিলেন, 'ভয় নেই মা,

আমি আপনাকে রক্ষা করিব।' পরদিনই সর্পাঘাতে পলাশলোচনের মৃত্যু হইল।

ভুলির মুখেই গল্পটি শুনিয়াছিলাম। আপনাদের বিশ্বাস হইতেছে না? এ যুগে না হওয়াই সম্ভব।

জম্পেশ

তুনকার মা গরিব। গাঁয়ের বাইরে প্রকাণ্ড একটা জঙ্গলের ধারে তার ছোট কুঁড়েঘর। মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি। তুনকার বয়স বছর কুড়ি। গ্রামে গিয়ে জনমজুরের চাকরি করে। তুনকার মা জঙ্গল থেকে কাটকুটো কুড়িয়ে আনে। তাই দিয়ে সে রান্না করে। জঙ্গলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ। কোন এক রাজার সম্পত্তি নাকি। জঙ্গলের ভিতরটা অন্ধকার। সেখানে ঢুকতে সাহস হয় না।

যেদিনের কথা বলছি সেদিন খুব ঝোড়ো হাওয়া বইছে। গ্রীষ্ম-কালের দুপুরবেলা, চারদিকে আগুনের হলকা ছড়িয়ে হু হু করে ছুটে চলেছে এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া। জঙ্গলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ-গুলো ঝড়ের দাপটে এঁকেবেঁকে আর্তনাদ করছে যেন। মনে হচ্ছে একটা অদৃশ্য দৈত্য দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে।

তুনকার মা উনুনে আগুন দেয় নি ঝড়ের ভয়ে। ভাবছিল রাতের জল-দেওয়া পান্তাভাত আছে, ক্ষিধে পেলে তাই খাবে। ঘরের জানালা কপাট বন্ধ করে বসেছিল তুনকার মা। বাইরে সোঁ সোঁ ভীষণ শব্দ, জঙ্গল একেবারে তোলপাড়। তুনকা এখন কোথায়? কখন ফিরবে সে? এই ঝড়ে জনমজুরের কাজ পেয়েছে কি? এই রকম নানা চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠছিল তার মন।

হঠাৎ তার কানে এল—বাইরে কে যেন বলছে—'তিন দিন খাই নি। বাঁচাও আমাকে, খেতে দাও চারটি—'

তুনকার মা জানালাটা একটু ফাঁক করে দেখলে—খুব রোগা

জরাজীর্ণ একটি বুড়ী ভিখারিনী তার বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে।

তুনকার মায়ের ঘরের সামনে আসতেই তুনকার মা তাকে ডাকলে —'তুমি এখানে এস।'

কপাট খুলে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। তার মনে হল বুড়ী ঝড়ের ধাক্কায় এখনি রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। হাত ধরে নিয়ে এল তাকে ঘরের ভিতর।

'তুমি কে মা' ?—জিজ্ঞেস করলে বুড়ী।

'আমি তুনকার মা।'

'তোমার ছেলে তুনকা কোথা।'

'কাজে বেরিয়েছে। সে জনমজুরের কাজ করে।'

'আমার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। একটু খাবার কোথায় পাই; তোমার ঘরে আছে কিছু।'

'আছে। পান্তা ভাত আছে। আর কাঁচা পেঁয়াজ।'

'বাঃ, সে তো চমৎকার হবে।'

তুনকার মা পান্তা ভাত নুন তেল দিয়ে মেখে দিলে।

বুড়ী পেঁয়াজ দিয়ে সেগুলি খেয়ে ফেললে চেটেপুটে।

'ভারী তৃপ্তি পেলাম। খুব আনন্দ হল—জম্‌পেশ তোমার ভালো করবে।'

'জম্‌পেশ কে ?'

'সে আছে একজন। ভালো লোকদের সে উপকার করে। যখনই কোন বিপদে পড়বে তখনি বোলো—জম্‌পেশ এস। সঙ্গে সঙ্গে সে হাজির হবে।'

'আপনি তবে তাকে ডাকলেন না কেন। আপনি তো বিপদে পড়েছিলেন—'

একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল বুড়ীর মুখে।

আমার কখনও বিপদ হয় না। পৃথিবীতে অনেক ভালো লোক

আছে। যখন বিপদে পড়ি তখন তাদেরই কেউ না কেউ এসে উদ্ধার করে দেয়। এই তো তুমি এখনই দিলে—আমার জম্‌পেশকে ডাকবার দরকার হয় না।'

হাসতে হাসতে উঠে পড়ল বুড়ী। দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকল। তুনকার মা কপাটটা বন্ধ করতে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল। বুড়ীকে আর দেখতে পেল না। একটু আশ্চর্য হল। এত অল্প সময়ের মধ্যে চলে গেল কি করে।

কপাট বন্ধ করে দিয়ে তুনকার মা একটু চিন্তায় পড়ল। যে ক'টা ভাত ছিল বুড়ীকে দিয়ে দিলাম। তুনকা যদি ফিরে এসে খেতে চায় কি দেব তাকে। ভেবেছিলাম আমি নিজে না খেয়ে ওর জন্যে রেখে দেব ভাতগুলি। ঘরে চাল বাড়ন্ত। তুনকা জানে এ কথা। সে যদি চাল কিনে আনে ভাতে ভাত ফুটিয়ে দেব। ঘরে দুটো আলু আছে।

রান্নাঘরে গিয়ে কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল। চারিদিকে খাবার সাজানো থরে থরে। হাঁড়ি ভরতি ভাত, গামলা ভরতি ডাল, নানা-রকম তরকারি, তাছাড়া অনেক মিষ্টি।

তুনকার মায়ের গা ছমছম করতে লাগল।

মনে হল কে এসেছিল আমার ঘরে…।

২

সেইদিনই রাত্রে আর একটা ঘটনা ঘটল।

রাত্রে তুনকা তার মায়ের পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ একটা খসখস শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। মনে হল তার বিছানার চারি-পাশে কি একটা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাত বাড়িয়ে দেখতে গিয়েই চমকে উঠল সে। সাপ! প্রকাণ্ড মোটা একটা ময়াল সাপ। জঙ্গলে ময়াল সাপ থাকে সে শুনেছিল। বোধ হয় ঝড়ের চোটে বেরিয়ে পড়েছে বন থেকে।

মা-মা ওঠ—ওঠ—সাপ—ময়াল সাপ ঢুকেছে ঘরে। আলো জ্বালো—

লণ্ঠন জ্বেলে শিউরে উঠল তার মা। সত্যি বিরাট একটা ময়াল সাপ। দরজার সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। ঘর থেকে বেরুবার উপায় নেই। সাপটা গলা বাড়িয়ে তুনকাকে ধরবার চেষ্টা করছে। একবার যদি ধরতে পারে পিষে মেরে ফেলবে। হঠাৎ মনে পড়ল সেই বুড়ীর কথা। সে জম্‌পেশকে ডাকতে বলেছিল। আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল তুনকার মা।

জম্‌পেশ এস—জম্‌পেশ এস।

জানালাটা খুলে দিল। জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে। আকাশে মেঘ ছিল না একটুও। হঠাৎ পশ্চিম দিগন্তে কিন্তু মেঘ উঠল একটা। শুধু উঠল না, এগিয়ে আসতে লাগল তার বাড়ির দিকে। তার বাড়ির কাছে যখন দাঁড়াল তখন মনে হল মেঘ নয় পাহাড়, আর সেই পাহাড়ের যেন দুটো বড় বড় পা রয়েছে থামের মতো। আকাশ থেকে যেন আকাশবাণী হল। 'আমি জম্‌পেশ এসেছি। কি দরকার, তোমাদের—'

চিৎকার করে উঠল তুনকার মা।

'আমাদের ঘরে প্রকাণ্ড একটা ময়াল সাপ ঢুকেছে। বাঁচাও আমাদের।'

'তোমাদের ঘর যে বড্ড ছোট, আমি ঢুকব কি করে।'

'যেমন করে পার ঢোক। সাপটা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে—'

প্রচণ্ড এক লাথিতে ভেঙে পড়ল ঘরের দেওয়াল। এক হেঁচকা টান দিয়ে ঘরের চালটা কে যেন দূরে ফেলে দিলে—।

তুনকার মা আর তুনকা দেখল এক বিরাটকায় মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন।

ময়াল সাপটা ঘরে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসেছিল। ঘরের দেওয়াল

তার উপর ভেঙে পড়াতে আর পালাতে পারে নি। সোঁ সোঁ শব্দ করছিল শুধু। একটু পরেই কিন্তু ভাঙা দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল তার মুণ্ডটা। দেখা গেল লকলক করে জিভ বার করছে। চোখ দুটো জ্বলছে যেন।

জম্‌পেশ হাঁক দিলেন—'গরুড় গরুড়—শীগ্‌গির চলে এস তুমি—ময়াল সাপটাকে নিয়ে যাও—'

আকাশ থেকে ডানা ঝটপট করতে করতে নেমে এল পক্ষীরাজ গরুড়। নিমেষের মধ্যে ময়াল সাপটাকে নখে করে তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশে। যেন ময়াল সাপ নয়, সামান্য একটা খড়কুটো।

অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তুনকা আর তুনকার মা।

'আর কি চাই তোমাদের?'

'আমাদের ঘর তো ভেঙে দিলেন। কোথায় এখন থাকব আমরা?'

'এখনই ঘর করে দিচ্ছি।'

আকাশের দিকে চেয়ে চিৎকার করলেন—'বিশ্বকর্মা, দু'জন ভালো মিস্ত্রী পাঠাও—'

দু'জন দেবদূত এসে হাজির হল সঙ্গে সঙ্গে। মাটি ফুঁড়ে উঠল যেন।

. জম্‌পেশ বললেন—'এদের জন্যে এখুনি ভাল বাড়ি তৈরি করে দাও। তোমরা এদিকে একটু সরে দাঁড়াও। এখুনি বাড়ি হয়ে যাবে তোমাদের।'

তুনকা আর তুনকার মা সরে দাঁড়াল। তারপর অন্ধকার হয়ে গেল চতুর্দিক। অন্ধকারের ভিতরেই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তারা। ভয় করতে লাগল। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে? অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ অন্ধকার চলে গেল, জ্যোৎস্নায় ভরে গেল চারিদিক। তখন তারা দেখতে পেল তাদের কুঁড়ে ঘর নেই। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে চমৎকার একটি মর্মর প্রাসাদ। যারা প্রাসাদ তৈরি করেছিল

তারা কেউ নেই। জম্‌পেশ কিন্তু দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন—'তোমাদের ঘর হয়ে গেছে। ওই ঘরে গিয়ে বাস কর তোমরা।'

'আমরা গরিব। আমরা কি অত বড় বাড়িতে থাকতে পারব?'

'গরিব কেন, ব্যবসা কর, বড়লোক হয়ে যাবে। তোমার ছেলে কি কাজ জানে—'

'ও জনমজুরের কাজ করে। কিন্তু খুব ভালো পুতুল গড়তে পারে ও। ওর বাবা ভালো প্রতিমা গড়ত—'

'বেশ তো পুতুলের ব্যবসাই কর।'

'কিন্তু তা করতে গেলে টাকা চাই বাবা। আমরা গরিব, কোথায় পাব টাকা—'

'টাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

আকাশের দিকে মুখ তুলে চিৎকার করলেন—'কুবের, কুবের শুনে যাও—'

জরির পাড় দেওয়া মিরজাই গায়ে বেঁটে মোটা একটি লোক এসে হাজির হলেন।

'দেখ কুবের, এরা বড় ভাল লোক। মায়ের ইচ্ছে এদের ভাল হোক। এরা গরিব, আমি এদের ব্যবসা করতে বলেছি। তুমি টাকা দেবে তো—'

'দেব।'

'কি করে দেবে?'

'কাছাকাছি কোন বটগাছ তলায় গিয়ে টাকা চাইলেই টাকা পাবেন। গাছের উপর থেকে টাকার থলি পড়বে। কিন্তু টাকাটা যেন সৎকার্যে ব্যয় হয়। এক পয়সাও যদি অসৎ কার্যে খরচ হয়, তাহলে আর টাকা আসবে না।'

জম্‌পেশ বললেন—'এরা ভালো লোক। এরা তা করবে না।'

'তাহলে টাকা পাবে।'

বলেই কুবের অন্তর্ধান করলেন।

নির্বাক্ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তুনকা।

তুনকার মায়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

'আপনি কে বাবা। আপনার পরিচয় দিন।'

জম্‌পেশ বললেন—'আমি? আমি মায়ের ছেলে।'

'কে আপনার মা।'

'শক্তি। তাঁব অনেক নাম। দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী শক্তিরই নাম। আরও অনেক নাম আছে তাঁর। অনেক সময় তিনি ভিখারিনীর বেশেও ঘুরে বেড়ান। তিনি সন্ধান করে বেড়ান কোথায় ভালো লোক আছে। ভালো লোকেরা যখন বিপদে পড়েন তখন তিনি আমাকে খবর পাঠান। আদেশ দেন ওদের দুঃখ দূর কর। আমি তাঁর আদেশ পালন করি মাত্র।'

'আপনার নাম জম্‌পেশ কেন।'

কারণ আমার মধ্যে কোনও ফাঁকি নেই। আমি যা করব ঠিক করি, তা করে তবে ছাড়ি। মা-ই এ নাম দিয়েছেন আমাকে—'

বলেই জম্‌পেশ অন্তর্ধান করলেন।

ছবি

গ্রহশান্তির জন্য একটি ভালো বৈদূর্য্য মণির সন্ধান করিতেছিলাম। কিন্তু কোথাও পাওয়া যাইতেছিল না। নকল মণি-মুক্তায় দেশ ছাইয়া গিয়াছে। আসল জিনিস পাওয়া শক্ত। আমি নিজেই একজন জহুরি তাই নকল জিনিস সহজেই ধরিয়া ফেলি। আমার একমাত্র পুত্রটি ভীষণ অসুস্থ, ডাক্তারেরা জবাব দিয়া গিয়াছেন। একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী বলিয়াছেন যদি দশ রতি ওজনের আসল বৈদূর্য্য আমার ছেলেকে ধারণ করাইয়া দিই আমার ছেলে ভালো হইয়া যাইবে। কিন্তু অত বড় আসল বৈদূর্য্য পাওয়া যাইতেছে না।

একজন বলিলেন—'রত্নাকর শর্মার বাড়ি যান। সেখানে পাবেন।

তিনি মণি-মুক্তার একজন বড় সংগ্রাহক। তবে ব্যবসায়ী নন। সেখানেই চেষ্টা করুন।' তিনিই আমাকে ঠিকানাটা দিলেন। আমি বত্নাকর শর্মার নাম শুনি নাই। রত্ন-সংগ্রাহকেব নাম রত্নাকর শর্মা শুনিয়া একটু কৌতুক-বোধ করিলাম।

একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। গলিব গলি তস্য গলির শেষ-প্রান্তে তাহার ত্রিতল বাড়িটি। স্থানটি বেশ নির্জন। মোটব সেখানে ঢোকে না। পাশেই একটি মজা পুকুর। নীচের বারান্দায় একটি বেঞ্চিতে শুইয়া তাঁহার ভৃত্যই সম্ভবত ঘুমাইতেছিল। লোকটি খুব বুড়া, মুখে দাঁত নাই, চুল পাকা। চোখের কোণে পিঁচুটি। মনে হইল সর্বদাই ঘুমায়।

সে বলিল—বাবু কাহারও সহিত দেখা কবেন না।

বলিলাম, আমার বিশেষ প্রয়োজন, দেখা করতেই হবে। আপনি একটু সাহায্য করুন আমাকে—

সঙ্গে সঙ্গে একটি পাঁচ টাকার নোটও তাহার হাতে দিলাম।

'আমি তাঁর বেশী সময় নষ্ট করব না। একটি জরুরি খবর জানতে এসেছি কেবল। দেখা হয়ে গেলে আপনাকে আরও পাঁচটি টাকা দেব।'

কাজ হইল।

লোকটি বলিল—তাহলে ওই সিঁড়ি দিয়ে সোজা উপরে উঠে যান। বাবু তিনতলায় আছেন।

ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম অনেক ছবি, কোনটা সমাপ্ত, কোনটা অর্ধ সমাপ্ত। ছবি আঁকিবার নানা সরঞ্জাম চারিদিকে ছড়ানো রহিয়াছে। মনে হইল কোনও আর্টিস্টের স্টুডিওতে ঢুকিয়াছি। তিনতলায় উঠিয়া দেখিলাম সিঁড়ির সামনেই একটি ঘরে তিনি বসিয়া আছেন। চেহারা দেখিয়া শ্রদ্ধা হইল। সৌম্যকান্তি, আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষু, গৌরবর্ণ, মাথায় কুঞ্চিত কেশ, গোঁফ দাড়ি কামানো। দেখিলাম তিনি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সামনের দেওয়ালটার দিকে চাহিয়া আছেন।

আমার পায়ের শব্দ শুনিয়া দ্বারের দিকে ঘাড় ফিরাইলেন।

'কে—'

'নমস্কার। আমার নাম পঞ্চানন দে। একটি বিশেষ দরকারে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি—'

'ও, কি দরকার বলুন। ভিতরে আসুন, বসুন।' ঘরে ঢুকিয়া আমি একটি চেয়ারে বসিলাম।

'কি দরকার আপনার।'

'শুনেছি আপনি নানারকম মণি সংগ্রহ করেন। আমার দশ রতি ওজনের একটি আসল বৈদূর্য্য চাই। যা দাম লাগে দেব। বাজারে কোথাও পাচ্ছি না। অথচ আমার দরকার খুব।'

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, 'দশ রতি ওজনের ভালো বৈদূর্য্য আছে আমার একটি। কিন্তু সেটা তো দিতে পারব না। সেটি আমার ফ্রেমে লাগাতে হবে। মিস্ত্রিকে খবর দিয়েছি কাল আসবে।'

'ফ্রেম? কিসের ফ্রেম?'

'ছবির ফ্রেম। আমি সারা জীবন ধরে যে সব মণি সংগ্রহ করছি তা লাগিয়েছি একটি চন্দন কাঠের তৈরি ফ্রেমে। আমি নিজের হাতেই তৈরি করেছি ফ্রেমটি। ভেবেছিলাম তার ছবি এঁকে ওই ফ্রেমে বাঁধাব। কিন্তু ছবি আঁকা হল না। হঠাৎ একদিনেই দু-চোখ অন্ধ হয়ে গেল।'

'কার ছবি—'

'তা বলব না।'

তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, 'বলা যায় না। ওটিই বোধহয় আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবি হ'ত।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম।

তাহার পর বলিলাম, 'ছবি যখন হয় নি তখন ফ্রেম নিয়ে আর কি হবে।'

'ছবি হচ্ছে। রোজই হচ্ছে। মনে মনে আঁকছি, কিন্তু পছন্দ হচ্ছে না। আবার নতুন ছবি এঁকে পরাচ্ছি ওই ফ্রেমে। ছবি আঁকা বন্ধ নেই। ফ্রেমের তিনদিকে তিনটে বৈদূর্য্য লাগিয়েছি, একটা দিক খালি আছে সেখানেও লাগাব।'

বলিলাম, 'আপনাকে একটি বড় বৈদূর্য্য আমি এনে দিতে পারি। কিন্তু সেটি আসল নয়, নকল—'

'না, ও ফ্রেমে কোনও নকল জিনিস চলবে না। আপনি ও ঘরে গিয়ে ফ্রেমটা দেখে আসুন।'

পাশের ঘরে গিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। প্রকাণ্ড একটা খালি ফ্রেম দেওয়ালে ঝোলানো রহিয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গে মণি-মাণিক্যের উৎসব। হীরা, মুক্তা, প্রবাল, নীলা, চুণী, পান্নার চমকপ্রদ প্রদর্শনী যেন একটি। দেখিলাম ফ্রেমের তিনদিকে তিনটি বড় বড় বৈদূর্য্য রহিয়াছে। একদিকে নাই।

ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম—'অপূর্ব জিনিস দেখলাম। আমি আপনাকে যে বৈদূর্য্যটা দিতে চাইছি, সেটাও ওখানে বেমানান হবে না। যদিও সেটি নকল।'

'না, কোনও নকল জিনিস চলবে না ওখানে। আপনি আসল বৈদূর্য্য নিয়ে কি করবেন?'

'আমার একমাত্র পুত্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেছেন। একজন জ্যোতিষী বলেছেন দশ রতি ওজনের আসল বৈদূর্য্য ধারণ করালে ও ভালো হয়ে যাবে। আপনি যদি দয়া করে—'

আর বলিতে পারিলাম না, আমার গলাটা কাঁপিয়া গেল।

তিনি চক্ষু বুজিয়া বসিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিলেন—'বেশ, দেব আপনাকে—'

তাহার পরই হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

'ছবি হয়ে গেছে। আমার ছবি হয়ে গেছে। অপূর্ব দেবী মূর্তিতে

মুখের কি ভাব, চোখের কি দৃষ্টি। এ যেন কমলা, মূর্তিমতী কমলা—'

তাহার পর আবার চোখ বুজিয়া নীরব হইয়া গেলেন। সমস্ত মুখে তন্ময় সমাহিত ভাব ফুটিয়া উঠিল।

আমি চুপ করিয়া বসিলাম।

খড়ের টুকরা

তিনুবাবু অবশেষে হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে ছোট ভাই বিনুর কাছেই তাঁহাকে এবার যাইতে হইবে। গত্যন্তর নাই। ক্রিকেট খেলিতে গিয়া একটি পা আগেই খোঁড়া হইয়াছিল। যে চাকরিটি করিতেন সেটি হইতেও অবসর লইয়াছেন কিছুদিন পূর্বে। মাসে প্রায় একশত টাকা করিয়া পেন্সন পাইতেছেন। তাহাতে কোনক্রমে তাঁহার চলিয়া যাইতেছিল। তিনু মূর্খ নন। তিনি সেকালের বি. এ পাশ। তাঁহার মা-ই তাঁহাকে জোর করিয়া স্কুল কলেজে পড়াইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে জমিজমা কিছু বিক্রয় করিতে হইয়াছিল, নিজের গহনাগুলিও তিনি বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল ছেলে বাপের মতো পণ্ডিত হোক। তিনু ও বিনুকে লইয়া যৌবনেই তিনি বিধবা হন। তিনু মায়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া বি. এ. পাশ করিলেন, কিন্তু বিনুর লেখাপড়া বিশেষ কিছু হইল না। সে গ্রামের স্কুল হইতে মাইনার পরীক্ষাটাও পাশ করিতে পারে নাই। তিনু লক্ষ্ণৌ শহরে চাকুরি করিতে লাগিলেন, বিনু গ্রামেই মায়ের কাছে রহিয়া গেল পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি লইয়া। তিনু বিবাহ করেন নাই। একটু শৌখীন গোছের লোক তিনি। গিলা করা আদ্দির পাঞ্জাবী পরিতেন, গোঁফে আতর লাগাইতেন, নাগ্রা পায়ে দিতেন, ব্যবহার করিতেন নানারকম শৌখীন জিনিস। মা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তাঁহাকে মাসে পঁচিশ টাকা করিয়া নিয়মিত

পাঠাইয়াছেন তিনি। মায়ের মৃত্যুর পর আর নিয়মিত পাঠাইতেন না, মাঝে মাঝে পাঠাইতেন। মায়ের মৃত্যু কুড়ি বছর আগে হইয়াছে। এ কুড়ি বছর তিনি দেশেও যান নাই। মাঝে মাঝে বিনুর সহিত পত্রালাপ অবশ্য হইয়াছে। চাকুরি হইতে অবসর লইবার পরও তিনি দেশে ফিরিয়া যাইবার কল্পনা করেন নাই। আয় কমিয়া যাওয়াতে বিনুকে মাঝে মাঝে যে টাকা পাঠাইতেন তাহাও আর পাঠানো সম্ভব হইতেছিল না। বিনু বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ছেলে মেয়ে হয় নাই। বউটি বন্ধ্যা। বিনুর আর একটি বিবাহ দিবার ইচ্ছা ছিল তিনুর। কিন্তু সেজন্য টাকা দরকার। সেই টাকাটা সংগ্রহ করিবার জন্য তিনু একটি টিউশনি জোগাড় করিয়াছিল। এই টিউশনিই তাহার কাল হইল। যে বাড়িতে টিউশনি লইয়াছিলেন সেখানে যাইবার একটি শর্টকাট রাস্তা ছিল রেললাইন পার হইয়া। সেই রেললাইন পার হইতে গিয়া একদিন তিনি রেলে চাপা পড়িলেন। প্রাণ গেল না, হাত দুইটি গেল। দুই হাতের কনুই পর্যন্ত কাটিয়া ফেলিতে হইল।

হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া তবে তিনি বিনুকে খবর দিলেন—আমি বড় বিপন্ন আমাকে আসিয়া লইয়া যাও। হৃদয়ঙ্গম করিলেন, যে কয়দিন বাঁচিবেন বিনুরই গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে। তাঁহার হৃদয়টা যেন হাহাকার করিয়া উঠিল! এতদিন যে স্বাধীন নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করিয়াছেন তাহা সহসা মরীচিকার মতো মিলাইয়া গেল। লক্ষ্ণৌ শহরে এতদিন বাস করিয়াছেন, বাংলাদেশের সেই স্যাঁত স্যাঁতে পাড়াগাঁয়ে কি এখন বাস করিতে পারিবেন? বাড়িতে মা নাই। মা-ই ছিল বাড়ির প্রধান আকর্ষণ। বিনুর বউ তাহার উপর বিরূপ, বিনু সমস্ত দিন মাঠে থাকে। সেখানে তাহার সেবা করিবে কে? সঙ্গী হইবে কে? ক্রাচের উপর ভর করিয়া কতদূর তিনি বেড়াইতে পারিবেন? একটা অন্ধকার ভবিষ্যৎ তাঁহার চোখের সামনে ঘনাইয়া উঠিল। মায়ের মুখটাই তিনি বারবার স্মরণ করিতে

লাগিলেন। কিন্তু সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে তিনি কোন আশার আলোক দেখিতে পাইলেন না। তখন পাইলেন না, কিন্তু পরে পাইয়াছিলেন। তাহা লইয়াই গল্প।

ষ্টেশন হইতে গরুর গাড়ি বাহিত হইয়া তিনু যখন তাহার গ্রামের বাড়িতে পৌঁছিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। তিনু দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বাড়িতে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলিতেছে। 'এদিকে ইলেক্‌ট্রিক এসেছে না কি!'

বিনু সহাস্যে বলিল—'এসেছে। আমি নিয়েছি—।' গাড়োয়ানের সাহায্যে বিনু তিনুকে লইয়া ঘরে একটি চৌকির উপর বসাইল। সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার। 'যাঃ লোড শেডিং হ'য়ে গেল। ইদানিং বড্ড বেশী লোড শেডিং হচ্ছে। ওগো কোথা গেলে। দাদা এসেছে— তুমি একটা আলো আন—'

বিনুর স্থূলকায়া পত্নী বেশ কিছুক্ষণ পরে একটি কেরোসিনের আলো লইয়া প্রবেশ করিল এবং তিনুর পায়ের কাছে আসিয়া টিপ করিয়া একটা প্রণাম করিল। মুখে ঘোমটা দেওয়া ছিল, তিনু তাহার মুখটা ভালো করিয়া দেখিতে পাইলেন না। প্রণাম করিয়া বিনুর বউ চলিয়া গেল। বিনু আবার একটু উচ্চকণ্ঠে বলিল— 'দাদাকে একটু মোহনভোগ করে দাও। আমি ছিয়া জেলের বাড়ি যাচ্ছি। ভাল কিছু মাছ রাখতে বলেছিলাম। দাদা, তুমি বিশ্রাম কর, আমি মাছটা নিয়ে আসি—'

বিনু বাহির হইয়া গেল। লণ্ঠনে বোধহয় তেল ছিল না। কয়েক মিনিট পরে সেটিও নিবিয়া গেল।

একা অন্ধকার ঘরে বসিয়া রহিলেন তিনু। তাঁহার মনে হইল, যে অন্ধকারে ভবিষ্যতে তাঁহাকে বাস করিতে হইবে তাহাই যেন মূর্ত হইয়াছে তাঁহার চোখের সামনে। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন তিনি। বিনু বা বিনুর বউ কাহারও দেখা নাই। খানিকক্ষণ পরে পদশব্দ

শোনা গেল। বিন্নুর বউ একটা প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করিল। ছোট মাটির প্রদীপ। সেটি ঘরের এক কোণে রাখিয়া সে আবার চলিয়া গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক দমকা হাওয়া ঢুকিল ঘরে। প্রদীপটাও নিবিয়া গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন তিনি। হতাশার সমুদ্রে একেবারে তলাইয়া গেলেন যেন। এমন সময় আশ্চর্য কাণ্ডটা ঘটিল। সহসা আতরের গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরিয়া উঠিল। যে আতর তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে মাখিতেন সে সেই আতর। তাহার পর মনে হইল কে যেন তাহার মুখটিতে হাত দিতেছে, কাহার বাহু যেন তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে। তিনুর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই ইলেক্‌ট্রিক আলোটা আবার জ্বলিয়া উঠিল, দেখিলেন ঘরে কেহ নাই। সহসা দেখিতে পাইলেন সামনের দেওয়ালে মায়ের ফটো টাঙানো রহিয়াছে। মায়ের মুখ যেন উদ্ভাসিত। চোখের দৃষ্টি জীবন্ত। তিনুর বুকটা ভরিয়া গেল। অলৌকিক? অসম্ভব? হোক্—তবু তাঁহার মনে হইল আর ভয় নাই। মা আছেন। এই অলীক খড়ের টুকরাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মজ্জমান তিনুর মনে আবার আশা জাগিল।

অতি-বিজ্ঞানীর গল্প

'আমার তো ঘড়ি-ফড়ি নেই জানিস, আমার সম্বল বাড়ির পিছনের তালগাছের ছায়াটা। সেটা যখন ছাতের উপর থেকে সরে যায় বুঝতে পারি সূর্য অস্ত গেল। এইবার আড্ডায় যেতে হবে। সেদিন কিন্তু এক আশ্চর্য কাণ্ড হ'ল। দেখলাম ছাতের ছায়াটা অনড় হয়ে আছে। বেরিয়ে দেখি সূর্যটা আটকে গেছে আকাশে—'

'আটকে গেছে?'

'হ্যাঁ। অস্ত যাচ্ছে না, থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠায়। চারিদিকে

হই-চই পড়ে গেছে। আমাদের বাড়ির পিছনের পুকুরটায় অনেক পদ্মফুল আছে। তাদের মুখ দেখে মনে হল তারা ভাবছে সূর্য তাদের দেখে এত মুগ্ধ হয়েছেন যে আর নড়তে পারছেন না। আকাশে দেখলাম অনেক এরোপ্লেন উড়ছে, অনেক বিজ্ঞানীরা বেরিয়েছেন ঠিক কারণটা নির্ণয় করবার জন্যে। রেডিওতে শুনলাম একদল বিজ্ঞানী নাকি সূর্যের দুটো চোখ দেখতে পেয়েছেন। আর একজন বিজ্ঞানী বলেছেন—মহাকর্ষ ও পারমাণবিক শক্তি নিয়ে কিছু বিজ্ঞানী experiment করছিলেন, তার ফলেই এই কাণ্ড। এদিকে সন্ধ্যা হয় না; নিশাচর পশু পাখীরা বেরুতে না পেরে চীৎকার জুড়ে দিল। পাড়ার ঘরে ঘরে শাঁখ বাজতে লাগল। মিলিটারিরা বন্দুক আর কামান উঁচিয়ে ভয় দেখাতে লাগল সূর্যকে। সূর্য কিন্তু অনড়। আমি তখন আমাদের গুরু পাঁড়েজির কাছে গেলাম। দেখলাম তিনি বম্ হয়ে বসে আছেন। সূর্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার খবরই রাখেন না। তাঁকে বললাম সব। তিনি বললেন আন্দাজ করবার দরকার কি, তুই নিজে সূর্যের কাছে গিয়ে জেনে আয় না। আমি বললাম, যাব কি করে। পাঁড়েজি বললেন—হাঁ কর। পাঁড়েজি কি একটা গুলি টুপ করে ফেলে দিলেন মুখের মধ্যে। গিলে ফেললাম সেটা। পাঁড়েজি বললেন—এইবার যা। আশ্চর্য কাণ্ড ভাই, বললে বিশ্বাস করবি না, হু হু করে' উড়ে চলে গেলাম আকাশে। সূর্যের মুখোমুখি হলাম একটু পরে। জিগ্যেস করলাম—কি ব্যাপার, অস্ত যাচ্ছেন না কেন।

সূর্য মুচকি হেসে বললেন—সিনেমা দেখব। দেখলাম সত্যিই তাঁর দুটো চোখ গজিয়েছে। বললাম, এতদূর থেকে সিনেমা দেখা যাবে না। আপনি মানুষের বেশ ধরে আমার সঙ্গে আসুন। টিকিট কেটে সিনেমা হলে ঢুকতে হবে। আমি সব ঠিক করে দেব। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। সূর্য মানুষের বেশ ধরতেই চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। তাঁকে একটি হিট্ করা সিনেমার টিকিট কেটে

ফার্স্ট ক্লাসে বসিয়ে দিলুম। তারপরই হল আর এক কাণ্ড। কয়েক মিনিট দেখার পরই হো হো—হো হো করে হেসে উঠলেন সূর্য। তারপর হাসতে হাসতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন রাস্তায়। আর চাপা পড়লেন একটা ডবল ডেকার বাসের তলায়। একটা হৈ হৈ উঠল। কিন্তু সূর্যের দেহটা কেউ খুঁজে পেল না। তা ছাতু হয়ে গিয়েছিল একেবারে। তার পরদিন সকালে আবার সূর্য উঠেছে দেখলাম। কিন্তু ও আসল সূর্য নয়। আসল সূর্য মারা গেছে। জোড়া-তাড়া দিয়ে ব্রহ্মা একটা-কাজ-চলা-গোছ মেকি সূর্য পাঠিয়ে দিচ্ছে। দেখছিস না এ সূর্যের কোন উত্তাপই নেই? শীতে প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে—'

গল্পটি শুনে বন্ধু তার পিঠ চাপড়ে বললে—'বাঃ বেশ জমিয়েছিস তো। নে আর এক ছিলিম সাজ—'

সুরমা

'একি তুমি এসেছ? এ যে প্রত্যাশার অতীত!'

সত্যিই সুরমা নামল একটি রিক্শা থেকে। রিক্শাতে আর একটি লোক বসেছিল। ময়লা কাপড় জামা পরা, কুণ্ঠিত, লজ্জিত। সুরমা একটি থলি নিয়ে নেমে এল।

'এস, এস, বস। চল ভিতরে যাই।'

'না, আমি বসতে আসিনি। এইটি ফেরৎ দিতে এসেছি।'

'কি ওটা?'

সুরমা জবাব দিল না। তার চোখের দৃষ্টিতে আগুনের ঝলক দেখে ভয় পেয়ে গেলাম।

'কি আছে ওই থলিতে—'

'তুমি যে গয়না আর টাকা পাঠিয়েছিলে আমার জন্যে। তুমি বেহায়া নির্লজ্জ তাই টাকা দিয়ে আমাকে কিনতে চাও। আর

আমার স্বামী ভীতু, ভাল মানুষ, ভদ্রলোক তাই তোমাকে জুতোপেটা করেনি। এই নাও—'

থলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল সুরমা। উঠে বসল রিক্‌শাতে। ময়লা কাপড় পরা কুণ্ঠিত লজ্জিত যে লোকটা রিক্‌শায় বসেছিল তার মুখে তখন হাসি ফুটল।

সে ওর স্বামী।

বাইজোভ

সুনীলার নাম সুকালো হলেই ঠিক হত। কিন্তু বর্তমান সভ্যতায় অপ্রিয় সত্যকে ক্রীম পাউডার মাখিয়ে আমরা প্রিয় করবার চেষ্টা করি। তাই ওই বার্ণিস করা কালো মেয়েটার নাম সুনীলা। সুনীলা কালো হলেও তার চোখ মুখ চমৎকার, তাকে সুন্দরীই বলা যায়। তার উপর লেখা পড়া শিখেছে, চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। ভালোই লাগে তাকে। সুনীলার এবং সুনীলার বাবা মায়েরও ইচ্ছা ছিল গৌরবর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর এমন একটি জামাই হবে যে সিনেমা-ওলাদের চোখ এড়িয়ে তাদের খপ্পরে পড়ে প্রতিবেশীদের ঈর্ষার আগুনে ভাজা ভাজা করে তুলবে। তার আমেরিকা বা ইংলণ্ড বা জার্মানীতে যদি বেশী মাইনের চাকরি থাকে তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

কিন্তু হল না। সব সাধ কি পূর্ণ হয়?

সুনীলার বিয়ে হ'লো এমন একটি ছেলের সঙ্গে যার রূপ তো নেইই, চমক-লাগানো গুণও নেই। বি. এ. পাশ। গ্রামে বসে সাহিত্য-চর্চা করে। থলথলে চেহারা, মুখখানা ঘুঁটের মতো। ছোট ছোট চোখ, থ্যাবড়া নাক, টেবো গাল, মেটে রং। জমি জমা অবশ্য অনেক, পায়ের উপর পা দিয়ে বিরাট একান্নবর্তী পরিবার খাচ্ছে। গরু আছে, মোষ আছে, পুকুর আছে। কিন্তু মোটর নেই। স্টেশন থেকে বাড়ি দশ ক্রোশ দূরে। কিছুদূর বাসে কিছুদূর গরুর

গাড়িতে যেতে হয়। জামাইর নামটাও অত্যন্ত সেকেলে ধরণের। গোবর্দ্ধন।

গোবর্দ্ধন প্রথম শ্বশুর বাড়ি বালীগঞ্জে এসেছে। তাকে দেখে সবাই হকচকিয়ে গেল। হাঁটু পর্যন্ত কাপড়, গায়ে একটা বুকবন্ধ জিনের কোট, পায়ে রং-চটা ডার্বি শু। মাথার চুল কদম ছাঁট। সে সাবান মাখে না, গন্ধ তেল মাখে না, পাউডার ব্যবহার করে না। টুথপেষ্টের বদলে দাঁতন ব্যবহার করে। সর্ষের তেল মাখে রোজ আধঘণ্টা ধরে। এই জানোয়ার দেখে সবাই তো অবাক।

গোবর্দ্ধন বললে—'একটু বেড়িয়ে আসি।'

সুনীলা বললে—'না, ওই বেশে তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। যেতে হলে ভদ্র বেশে যাও।'

'বেশ ভদ্র বেশ তুমিই পছন্দ কর। যা পরতে বলবে তাই পরব।'

সেই দিনই সুনীলা আবিষ্কার করল যে গোবর্দ্ধন লেংটিও পরে। পালোয়ানদের মতো।

বলল,— 'ছি ছি লেংটি বড় ভালগার। ও পরতে হবে না।'

'ওটা না পরলে আমার কেমন যেন স্বস্তি হয় না।'

'কেন আণ্ডারউয়ার পর না।'

'না লেংটিই থাক। ওটা তো ঢাকা থাকবে, কেউ দেখতে পাবে না।'

গোবর্দ্ধন লেংটির উপর কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি পরল, সিল্কের গেঞ্জি পরল, সিল্কের পাঞ্জাবী চড়াল, হাতে পরল সর্বাধুনিক সোনার রিস্টওয়াচ। আঙুলে হীরের আংটি।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত গোবর্দ্ধনকে ফিরতে না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল সবাই। নতুন জামাইকে সম্বর্ধনা করবার জন্য এসেছিলেন মিস্টার গোহ, মিস্টার চাকরাভারটি, মেজর গাগা, ডকটর তরফদার। সবাই স্যুট পরা আধুনিক ভদ্রলোক। আধুনিকা মহিলাও ছিলেন কয়েকজন। রাত দশটার পর গোবর্দ্ধন এল।

পরিধানে লেংটি ছাড়া আর কিছু নেই।

কি ব্যাপার।

'সব কেড়ে নিয়েছে। ভাগ্যে লেংটিটা পরেছিলাম, তা না হলে উলঙ্গ হয়ে আসতে হ'ত।'

মেজর গাগা সবিস্ময়ে বলে উঠল—'বাইজোভ'।

তা এবং লা

অতি-দূর ভবিষ্যতের পটভূমিকায় এই গল্প।

মানুষ বিজ্ঞান-চর্চায় আশ্চর্যরকম অগ্রসর হয়েছে। সব রকম অগ্রগতির বিস্তৃত বিবরণ এ গল্পের পক্ষে অবান্তর। যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই বলব। সে যুগে পৃথিবীর স্থলে, জলে, ভূগর্ভে সর্বত্র মানুষ বসবাস করছে বিজ্ঞানের জোরে। অন্তরীক্ষেও চলন্ত বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে এরোপ্লেনের মতো। মাটিতে থাকবার জায়গা নেই, শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেকে। মাটিতে নামবার যখন ইচ্ছা হয় তখন বাড়িটাকে শূন্যে থামিয়ে যন্ত্রযোগে নেমে আসে তারা কোনও বড় শহরের পার্কে, কখনও কাশ্মীর, কখনও জাপান, কখনও আমেরিকা, কখনও বা আর কোথাও, যখন যেমন খুশি। তবে বেশির ভাগ তারা উড়ে উড়েই বেড়ায়। আর একটা নতুন জিনিস হয়েছে। নাম সব এক অক্ষরে। সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এসব নাম একেবারে অচল। পোষাক পরিচ্ছদও খুব সংক্ষিপ্ত। অধিকাংশ সময়ই উলঙ্গ হয়ে থাকে। এখন আমরা সমাজ বলতে যা বুঝি সে রকম সমাজও নেই। রোজকারের সমস্যা নেই। বিরাট এক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই যন্ত্র প্রত্যেক মানুষের দেহ থেকে সর্বক্ষণ শক্তি নিষ্কাষিত করে নিচ্ছে। আর সেই শক্তি রূপান্তরিত হচ্ছে, খাদ্যে বস্ত্রে আর মানুষের বিবিধ প্রয়োজনে। বিতরিত হচ্ছে বিনামূল্যে। এও হচ্ছে যন্ত্রের সাহায্যে। বোতাম টিপলেই 'ফোন'

আবির্ভূত হচ্ছে শূন্য থেকে, ফোনে কি চাই বলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে এসে যাচ্ছে সে সব। যন্ত্রযোগেই আসছে। মানুষের আধিভৌতিক প্রয়োজনও কমে গেছে। মানুষ তৈরী হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে। এর ফলে যৌন আকাঙ্ক্ষা, এমন কি শারীরিক যৌন চিহ্নগুলোও লোপ পেয়েছে। নারীদের স্তন নেই, নিতম্বও প্রায় পুরুষের মতো। সন্তান উৎপাদন করবার শক্তি কারো নেই। জন্মের কিছু পরেই স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই যন্ত্রের সাহায্যে বন্ধ্যা করে দওয়া হয়। তবে কিন্তু প্রেম হয়। মানসিক বিনোদনই এখন প্রেমের আকর্ষণ। নাচ, গান, ম্যাজিক দেখানো, আলাপ কুশলতা, অভিনয় পারিপাট্য অদ্ভুত উৎকর্ষ লাভ করেছে। মানুষের আধিভৌতিক দুঃখ ঘুচেছে, সাম্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবু কিন্তু মানুষের মনে সুখ নেই। কি একটা নামহীন অজানা দুঃখে সবাই পীড়িত। কেউ কেউ মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যায়। পাগল হয়ে গেলেই বৈজ্ঞানিক কৌশলে তার বাড়িটা বর্ণপরিবর্তন করে। হয়ে যায় লাল। তখন চিকিৎসকরা এসে সেই উন্মাদকে পাগলা গারদে নিয়ে যান। উড়ন্ত বাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবার উপায় নেই। লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করলেই কপাট জানালা আপনি বন্ধ হয়ে যায়, খোলা বারান্দার উপর শূন্য থেকে আবির্ভূত হয় লোহার জাল। আগেই বলেছি বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি হয়েছে। এখন মানুষ বিব্রত কেবল মন নিয়ে। মনকে ভোলাবারও বহু রকম আয়োজন করেছেন বিজ্ঞানীরা। নানারকম শব্দ, সুর, গান, কবিতা, গল্প, চিত্রময়, আলোর বৈচিত্র্যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। রেডিও, টেলিভিশন পুরোনো হয়ে গেছে। নতুন একরকম জিনিস বেরিয়েছে যার নাম পাস্টোস্কোপ (Pastoscope)। বাংলায় বললে বলতে হয় —'অতীত-বীক্ষণ'। দেওয়ালে প্রকাণ্ড একটি কাচ আর তার চারদিকে নানারকম বোতাম ফিট করা। একটা বোতাম টিপে দিলেই শাদা কাচটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারপর তার উপরে ছবি ফুটবে নানারকম।

অতীত যুগের পাহাড়ের ছবি, নদীর ছবি, সাগরের ছবি। ইজিপ্টের ফারাওদের ছবি, নেবুচেদনাজারের ছবি, উরের ছবি, ব্যাবিলনের ছবি —কতরকম ছবি। সে ছবির পরিচয়ও দেবে পাসটোস্কোপ আর কটা বোতাম টিপলে। যে, যে ভাষাতেই শুনতে চায় সেই ভাষাতেই কথা বলবে পাস্‌টোস্কোপ। কোন অজ্ঞাত কারণে মাঝে মাঝে অসম্ভব কাণ্ড হয়। কোন কোনও ছবি নিজেই কথা বলতে আরম্ভ করে— তুমি যে ভাষা জান, সেই ভাষাতেই আত্মপরিচয় দেয় সে। কি করে এ অঘটন ঘটে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের প্রচুর গবেষণা চলছে। কিন্তু স্থির কোনও সিদ্ধান্তে এখনও উপনীত হতে পারেন নি তাঁরা। এ রকম অঘটন কিন্তু মাঝে মাঝে ঘটে। সেদিন অন্তত ঘটেছিল।

তা এবং লা ঘুরে বেড়াচ্ছিল একটি উড়ন্ত বাড়িতে। 'তা' পুরুষ 'লা' স্ত্রীলোক। 'তা' চমৎকার ম্যাজিক দেখাতে পারে, 'লা' প্রথম শ্রেণীর নর্তকী। সে যখন ঝড়ের নাচ নাচে মনে হয় সত্যিই ঝড় উঠেছে যেন, জ্যোৎস্নার নাচ নাচবার সময় অঙ্গের মৃদু হিল্লোলে এমন স্বপ্নময় আবেশ সৃষ্টি করে যা শুধু জ্যোৎস্নালোকেই হওয়া সম্ভব। 'তা' এবং 'লা' ভালবাসে পরস্পরকে। 'তা' 'লা'-কে ভুলিয়ে রাখে যাদু-বিদ্যা দিয়ে আর 'লা' 'তা'-কে ভুলিয়ে রাখে নাচ-গান দিয়ে। দুজনেই খুব ছিপছিপে রোগা। কারো মাথায় চুল নেই, কারণ প্রকৃতি যে প্রয়োজনে চুল সৃষ্টি করেছিল সে প্রয়োজন অনেকদিন আগেই ফুরিয়েছে। তবু তারা সুন্দর। একটা অপার্থিব দীপ্তি যেন ফুটে বেরুচ্ছে তাদের সর্বাঙ্গ দিয়ে। চোখগুলি জ্বলজ্বল করছে, মনের অসীম ঔৎসুক্য মূর্ত হয়েছে চোখের দৃষ্টিতে, তার সঙ্গে মিশে আছে নামহীন একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা আকুতি। দীপ্তিমান গন্ধর্বলোক-বাসী যেন ওরা। একটু আগেই চন্দ্রলোক পরিক্রমা করে এসেছে তা এবং লা। আমরা যেমন সহজেই শহরের এক পার্ক থেকে আর এক পার্কে যাই ওরাও তেমনি গ্রহ-উপগ্রহে ঘুরে বেড়ায়। নক্ষত্রলোকে যাওয়া কিন্তু তখনও সহজ হয়নি। মাঝে মাঝে দুই একজন হু হু করে

নক্ষত্রের দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু আর ফেরে না। 'লা'-এর এক বান্ধবী 'কি' তার প্রণয়ী 'নূ'-র সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিল স্বাতী নক্ষত্রের দিকে, সৌরজগৎ একঘেয়ে মনে হচ্ছিল তাদের কাছে। পাঁচ বছর আগে গিয়েছিল, আর ফেরে নি। চন্দ্রলোক থেকে ফিরে এসে 'লা' বললে—'কাছে গিয়ে চাঁদকে ভালো লাগে না। কতকগুলো খসখসে পাহাড় খালি। আর চাঁদের উপর অদ্ভুত পোশাক-পরা যে লোক-গুলো বাস করছে তাদের মানুষ বলেই মনে হয় না। মনে হয় নানা আকারের সিন্দুক। ওখানে ওই পোশাক পরে নাচা তো অসম্ভব। কিন্তু 'তা' এবার কিছু কর একটা। ভাল লাগছে না।'

'তা' বললে 'তুমি নাচ না একটু।'

'আমার নাচ কতবার দেখবে? একঘেয়ে লাগে না তোমার? ম্যাজিক দেখাও তুমি বরং—'

'আমার ম্যাজিকও তো একঘেয়ে হ'য়ে গেছে। আবার দেখবে?'

'থাক। ওই পাসটোস্কোপটা খোল তাহলে অতীতের পৃথিবী দেখা যাক। ভারী সুন্দর লাগে আমার অতীতকে দেখতে!'

'তা' পাস্‌টোস্কোপের বোতামটা টিপে দিতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুগ্ধ-ধবল কাচটা। তারপর তার উপর ছবি ফুটতে লাগল। বড় বড় সাগরের ছবি, পাহাড়ের ছবি, যে স্থলপথ দিয়ে এককালে আমেরিকার সঙ্গে এশিয়ার যোগ ছিল সেই স্থলপথটাও দেখা গেল, প্রাচীন ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগান, ঘন চাপদাড়িওলা আসুরদের ছবি একে একে ফুটতে লাগল পাস্‌টোস্কোপে। তারপর হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল সব। আপনি নিবে গেল পাসটোস্কোপের আলোটা। সাধারণত এমন হয় না। তারপরই শোনা যেতে লাগল বাজনা। বিরাট গম্ভীর একটা আওয়াজের পটভূমিকায় ফুটে উঠতে লাগল কত রকম বাজনার সুর। কত রকম বাজনা, কত দেশের বাজনা। তারপর ধীরে ধীরে ফুটে উঠল বিরাট একটা স্বর্ণময় প্রাসাদ। কাঠের তৈরী প্রাসাদ কিন্তু সোনার পাত দিয়ে মোড়া। চারদিকেই অলিন্দ, প্রত্যেকটি

অলিন্দে ঝুলছে নানারঙের পরদা। প্রত্যেক অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছে সুবেশা সুন্দরী ক্রীতদাসীরা। বিরাট প্রাসাদকে বেষ্টন করে আছে বিরাট বাগান। বাগানে কতরকমের গাছ, কত রকমের ফুল, কত-রকমের পাখি। মাঝে মাঝে শ্বেত মর্মরের গভীর পুষ্করিণী, তাতে অজস্র পদ্ম আর তার ভিতর থেকে কারুকার্যখচিত রূপোর দণ্ডের উপর ফুলের তোড়ার মত উৎস, সে সব উৎসমুখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সুগন্ধি জলধারা। প্রাসাদের দ্বারে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে কৃপাণ হস্তে প্রহরী, কোনটা মিশরীয় কোনটা কাফ্রি, কেউ গ্রীক, কেউ বা ভারতীয়

পাসটোস্কোপ ঘোষণা করল, প্রাচীনকালের একটা পারস্য সম্রাটের প্রাসাদ এটি।

প্রাসাদ ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গেল। তারপর রঙ্গমঞ্চে এসে হাজির হলেন স্বয়ং সম্রাট। পোশাক বেগুনি আর সাদার এক অপূর্ব সমন্বয়, পরিধানে লাল মখমলের পায়জামা। কোমরে একটা স্বর্ণখচিত কটিবন্ধন মাথায় টায়রা। তার উপরে নীল রঙের পাগড়ি। চোখ দুটি প্রেময়। চিবুকে ছোট একটু দাড়ি, সরু গোঁফ। একটু দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটি সোনার দোলনা। দোলনার উপর মণি-মুক্তার ঝালর ঝুলছে। দোলনার চারিধারে ফুলের মালা জড়ানো। একজন রূপসী ধীরে ধীরে দোলনাটি দোলাচ্ছে। সম্রাট এসে দাঁড়ালেন প্রকাণ্ড একটি ছবির সামনে। তন্বী যুবতীর ছবি একটি। ছবিকে সম্বোধন করে সম্রাট বলতে লাগলেন—'রায়না তুমি কোথায়? তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম পথের ধারে। আমি যখন শোভাযাত্রা করে যাচ্ছিলাম তখন পথের ধারে অসংখ্য নর্তকীর মধ্যে ছিলে তুমি। প্রথম দর্শনেই ভালবেসেছিলাম তোমায়। যদিও আমি পারস্যের সম্রাট, যে কোনও নারীকে কামনা করবামাত্রই তাকে পাবার রাজকীয় অধিকার আমার ছিল। কিন্তু রাজকীয় নিয়ম অনুসারেই সঙ্গে সঙ্গে পাইনি তোমাকে। তোমাকে নিয়ে একবছর সহবৎ শিক্ষা দেওয়া

হয়েছিল সম্রাটের উপযুক্ত সঙ্গিনী হবার জন্য। এক বছর পরে তোমাকে পেয়েছিলাম। তিনশত রানী ছিল আমার রাজকীয় আইন অনুসারে প্রত্যেকের কাছেই পালা করে যেতে হত আমাকে। কিন্তু রায়না, তুমি ছিলে আমার প্রিয়তমা। সর্বক্ষণ তুমি আমার কাছে থাকতে। তোমাকে একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারতাম না আমি। একটি ছেলেও হয়েছিল আমাদের। সেই ছেলে হতে গিয়েই মারা গিয়েছিলে তুমি। সত্যিই কি তুমি আর নেই? ছেলের কথা কি একবারও মনে পড়ে না তোমার—'

সম্রাট ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন দোলনাটার দিকে। তারপর দোলনার ভিতর থেকে শিশুটিকে কোলে নিয়ে এগিয়ে এলেন আবার ছবির সামনে। লা সাগ্রহে দেখছিল শিশুটিকে। কি চমৎকার ছেলটি। লা-এর সমস্ত অন্তর দৃষ্টিপথ দিয়ে ছুটে গেল ওই শিশুটির দিকে, ঘিরে ধরল তাকে। জাপটে ধরে আদর করতে লাগল। চুমুতে চুমুতে ভরে দিল তার সর্বাঙ্গ। থর থর করে কাঁপতে লাগল লা।

সম্রাট অধীর ভাবে বলতে লাগলেন ছবিটির দিকে চেয়ে—'একে কি একবারও মনে পড়ে না তোমার? কোথায় তুমি? আর কি তোমায় পাব না?…'

শিশুর ধাত্রী ছেলেটিকে নিয়ে গেল সম্রাটের কাছ থেকে। পদ-চারণা করতে লাগলেন সম্রাট। তারপর হঠাৎ ছবিটার সামনে থেমে বললেন—'ব্যাবিলন থেকে এক জ্যোতিষী এসেছিল। সে কিন্তু আশা দিয়ে গেছে। বলেছিল অতিদূর ভবিষ্যতে আবার আমাদের মিলন হবে। কিন্তু অদ্ভুত সে মিলন। সে আমাকে এই জিনিসটা দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল এর মধ্যেই আবার মিলিত হব আমরা—কিন্তু আমি এর রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারি নি।'

সম্রাট জামার পকেট থেকে একটি তালা বার করলেন। তারপর ছবির দিকে সেটি তুলে ধরে বললেন, 'এই তালার মধ্যে কি করে আমাদের মিলন সম্ভব?'

হঠাৎ চীৎকার করে উঠল তা এবং লা। পরমুহূর্তেই দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল তারা।

দুম করে একটা শব্দ হল।

পাসটোস্কোপটা থেমে গেল।

নক্ষত্র ও প্রেতাত্মা

আকাশে অপূর্ব দ্যুতি বিকিরণ করিয়া একটি নক্ষত্র জ্বলিতেছিল। প্রেতেরাও শূন্যে সঞ্চরণ করে। নক্ষত্রটিকে দেখিয়া একটি প্রেত সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া পড়িল। আরও আশ্চর্যের বিষয় প্রেতটিকে দেখিয়া নক্ষত্র বলিয়া উঠিল—'অ, আপনি এসে গেছেন! কি ক'রে এলেন—'

'স্বদেশী-ওলারা আমাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে।'

'আমি জানতাম এ শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে। স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকরা কখনও রেহাই পায় না—'

'আপনি কে! আপনাকে তো চিনতে পারছি না ঠিক। আপনাকে ঘিরে এত জ্যোতি কেন।'

'জ্যোতি আছে না কি, বুঝতে পারছি না তো।'

'আমার গা দিয়ে কি কোন জ্যোতি বেরুচ্ছে?'

'না, আপনি ছায়ার মতো।'

'কিন্তু আপনাকে আমি চিনতে পারছি না।'

'আমি কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনেছি। আপনিই তো পুলিশ ডেকে আমাকে মোকামা ষ্টেশনে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আমি কিন্তু ধরা দিই নি, রিভলভার দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলাম। আপনি এত রকম ফন্দী ফিকির করেও আমাকে ধরতে পারেন নি। মা আমাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন—'

'মা? কোন মা—'

দেশমাতৃকা'

ও! আপনি প্রফুল্ল চাকী নাকি?'

'হ্যাঁ—'

'ও হো হো হো হো—'

একটা তীব্র তীক্ষ্ণ হাহাকারে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেতাত্মা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বিশু আর ননী

একমাত্র ছেলের বাড়াবাড়ি অসুখ। বাবার চিকিৎসা করাবার সঙ্গতি নেই, খাওয়াই জোটে না দুবেলা। কিন্তু ছেলের এই অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থা দেখে চুপ করে বসে থাকা যায় না। গ্রামে ডাক্তার নেই। কারণ কোনও 'ভদ্রলোকের বসবাস করবার ব্যবস্থাই নেই গ্রামে। একজন ডাক্তার এসেছিলেন। দিন পনেরো থেকে চলে গেছেন তিনি। পনেরো ক্রোশ দূরে না কি বড় সরকারি হাসপাতাল আছে। দশ বছরের ছেলেকে কোলে করে সেই হাসপাতালের উদ্দেশেই বেরিয়ে পড়ল বিশু চাষা অবশেষে। দু'দিন পরে শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে যখন পৌঁছল তখন অবাক হ'য়ে গেল সে। সত্যিই বড় হাসপাতাল। বড় বড় থাম—সারি সারি বাড়ি। গিজ গিজ করছে লোক। মোটর যাওয়া আসা করছে ক্রমাগত। ছেলেটিকে নিয়ে সে হাসপাতালের বারান্দার উপর উঠল। সবাই কোট প্যাণ্ট পরা। ডাক্তার কে! অনেক কষ্টে অনেকক্ষণ পরে একজন ডাক্তারের নাগাল পেল সে অনেক ঘোরাঘুরি করে। ডাক্তার বললেন—বেড নেই। বেড নেই মানে? বুঝতেই পারল না বিশু। তারপর আর একটা ধূর্ত্ত গোছের লোক এল। সে-ও কোট-প্যাণ্ট পরা। বলল, গোটা পঁচিশেক টাকা যদি ছাড়তে পার আমি ভর্ত্তি করিয়ে

দেব। বিশু কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠে বল্লে—পঁচিশ টাকা! আমার তো অত টাকা নেই। 'তাহলে রাস্তা দেখ' বলে চলে গেল লোকটি। আর একজনকে বিশু ধরল, তাতেও কিছু হ'ল না। তখন আর একজনের পা জাপটে ধরে 'হাউ হাউ করে' কেঁদে সে বলল—"এত বড় হাসপাতালের বারান্দায় শুয়ে কি আমার ননী বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। দয়া করুন, দয়া করুন ডাক্তারবাবু—।" ডাক্তারবাবু বললেন—"আচ্ছা চল দেখি। বেড নেই। বারান্দাতেও জায়গা নেই। মাটিতে শুয়ে থাকতে হবে একধারে। আপত্তি নেই তো?"

"তাই শুয়ে থাকবে ডাক্তারবাবু। ওকে ওষুধ দিন।"

ডাক্তারবাবু ব্যবস্থা করে' চলে গেলেন। নার্স এল, দুটো বেয়ারা এল। কিন্তু ওষুধ এল না। ঘণ্টা দুই পরে একটি লোক এসে বলল —"বিনি পয়সায় চিকিৎসা হয় না। পয়সা দাও কিছু কম্পাউণ্ডারকে—"

"পয়সা তো নেই। পরে না হয় ভিক্ষে সিক্ষে করে এনে দেব। এখন ওকে ওষুধ দিতে বলুন।"

দু' ঘণ্টা কেটে গেল। ওষুধ এল না।

হঠাৎ বিশু লক্ষ্য করল, ননী খাবি খাচ্ছে।

"ওরে বাবা ননীরে—।"

একটা লরির আর্ত্তনাদে তার আর্ত্তনাদ চাপা পড়ে গেল।

পরদিন খবরে কাগজে ছাপা হল—স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এবার দেশের লোকের সুচিকিৎসার জন্য নাকি কয়েক কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার।

সত্য

গুলি চলছিল। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল, পালাচ্ছিল দলে দলে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এসেছিল ওরা। ব্যর্থ হয়েছে। অন্যায়ের প্রতিকার পায় নি, ন্যায়ের আশ্বাসও পায় নি। পেয়েছে গুলি। গুলির সামনে কে দাঁড়াতে পারে? হুড়মুড় করে পালাচ্ছিল সবাই, মনে হচ্ছিল ঝড়ের দাপটে একরাশ ধুলো যেন উড়ে যাচ্ছে। একটা অন্ধকারও ঘনিয়ে এসেছিল চারদিকে। মনে হচ্ছিল অন্যায়ের কাছে ন্যায় বুঝি হেরে গেল। কিন্তু হঠাৎ একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। সেই ধুলোর রাশির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সে। ধুলো নয় মানুষ। চীৎকার করে উঠল—পালিও না দাঁড়াও।

সেই চীৎকারের মধ্যে কি ছিল জানি না, যারা পালাচ্ছিল তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝড়ের মুখে রুখে দাঁড়াল ধুলোরা।

'এস আমার সঙ্গে।'

চেঁচিয়ে উঠল সত্য।

বীরবিক্রমে এগিয়ে গেল সে। জনতা চলতে লাগল তার পিছু পিছু। গুলি আবার শুরু হল। মরল অনেকে, কিন্তু থামল না, পালালও না। একটু পরে সত্যও পড়ে গেল! ভাবলাম সত্য বুঝি মরে গেল। কিন্তু দেখলাম মরে নি। গুলি লেগে তার হাঁটুটা চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু জিতেছে ওরা। ন্যায়ের কাছে অন্যায়কে নতি স্বীকার করতে হয়েছে।

॥ দুই ॥

অনেক দিন পরে।

আবার যুদ্ধ বেধেছে। সেই চিরন্তন যুদ্ধ। ন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়ের।

অন্যায় এবারও প্রবল। তার গুলি গোলা সেনা-সামন্ত অনেক। এবারও পালাতে লাগল অসহায় ভীতুর দল। মনে হচ্ছিল এবার বুঝি ওদের পরিত্রাণ নেই, মেরে পিষে চষে' ফেলবে এবার।

হঠাৎ আবার বেরিয়ে এল সে।

দুই বগলে ক্রাচ্ (crutch)···

খটাস্—খটাস্—খটাস্—কাছে এগিয়ে আসছে। চোখের দৃষ্টিতে আগুন।

'পালিও না, এস আমার সঙ্গে।'

তার বজ্রনির্ঘোষে কম্পিত হয়ে উঠল দিকদিগন্ত।

'এস।'

দুই বগলে ক্রাচ্, তবু সে অগ্রণী।

খটাস্—খটাস্—খটাস্—খটাস্—খটাস্।

সোজা ঢুকে পড়ল শত্রুসৈন্যের মধ্যে।

জনতা ছুটল তার পিছু পিছু। জনতা নয় যেন সমুদ্র। ঢেউয়ের পর ঢেউ তারপব আবার ঢেউ।

এবার গুলি এসে বিঁধল সত্যর বুকে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, হায় হায় করে উঠল জনতা তার মৃতদেহটা ঘিরে। কিন্তু দেখলাম, না, সে এবারও মরে নি। তার মৃতদেহ থেকে যে সত্য বেরিয়ে এল তার শির আকাশচুম্বী, তার দেহ আলোকময়, তার দৃষ্টি জ্বলন্ত সূর্য, তাব বাণী অভ্রান্ত, তার নেতৃত্ব তুলনা-হীন। কোন গুলি আর তাকে মারতে পারবে না। চিরকাল সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে এবং জিতবে। সত্য অমর।

আমার পরিচয় জানতে কৌতূহল হচ্ছে?

আমার নাম ইতিহাস।

রবারের হাতী

চার পাঁচ দিন থেকে ক্রমাগত বৃষ্টি পড়ছিল। কলকাতার রাস্তা সব নদী হয়ে গেছে। সমস্ত আকাশটা মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝে দমকা এলোমেলো হাওয়া। বৃষ্টি কখনও ঝির ঝিরে কখনও ইল্‌শে গুঁড়ি, কখনও আবার মুষল ধারা। যারা চাকরি করে তারা প্যাণ্ট গুটিয়ে রবারের জুতো পরে ছপ ছপ করে যাচ্ছে, যাদের পয়সা আছে তারা ওয়াটার প্রুফ গায়ে দিয়েছে। নেহাত দায়ে না পড়লে বাড়ি থেকে কেউ বেরুচ্ছেই না। দু'একটা ছোট ছেলে-মেয়ে অবশ্য বেরুচ্ছে কাগজের নৌকো ভাসাতে কিম্বা এমনি ছপ ছপ করে বেড়াবার জন্যে। বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই।

গৌতম ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে ঠিক করে ফেলল তাকেও আজ বেরুতে হবে। বেরুতেই হবে। কারণ সে তুফানীকে কথা দিয়েছে। তুফানী কোন লাট-বেলাট নয়। চার বছরের মেয়ে একটি। বিশেষ করে সেই জন্যেই—গৌতমের মনে হল—কথাটা রাখতে হবে। লাট-বেলাটরা তোমার কথার দাম দেয় না, তুফানী কিন্তু দেয়, লাট-বেলাটরা তোমার প্রত্যাশায় বসে থাকে না, তুফানী কিন্তু থাকবে। তুফানী বিশ্বাস করে বসে আছে এই রবিবার গৌতমদা নিশ্চয় আসবে রবারের হাতীটা নিয়ে।

তুফানীরা এককালে গৌতমদের পড়শী ছিল। ঠিক পাশের বাড়িতেই থাকত। তুফানীর বাবা একদিন অপিস থেকে ফিরল না। শোনা গেল সে 'বাস' চাপা পড়েছে। মারা যায় নি। হাত দুটো কাটা গেছে। কেরাণী-গিরি করত, সুতরাং চাকরিও গেছে। তুফানীর মা খাইয়ে দেয় তাকে। এ পাড়ায় থাকতে পারল না তারা। চাকরি নেই, অত টাকা বাড়ি ভাড়া গুনবে কি করে। তুফানীর মাকে রাঁধুনি-বৃত্তি করতে হবে। কিন্তু যে পাড়ায় সে

নিজেই কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড চাকর রেখেছিল সে পাড়ায় সে নিজে রাঁধুনি বৃত্তি করবে কি করে। তুফানীরা তাই চলে গেছে হাওড়ায়, তাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে। সেখানে তুফানীর মা চাকরী পেয়েছে। একটি বৃদ্ধের তত্ত্বাবধান করতে হবে। খাওয়া-পরা ছাড়া মাইনে পাবে ষাট টাকা। বুড়োর কেউ নেই। যে মেয়েটি তাঁকে দেখা শোনা করত সে কিছুদিন আগে মারা গেছে। তুফানীর মা সেই কাজটা করবে এখন।

বস্তির মধ্যে একটা দোতলা পুরনো মাটির বাড়ির একতলায় একটা ছোট ঘর ভাড়া নিয়েছে। এই সুযোগকে সুবর্ণ সুযোগ বলে গণ্য করল সবাই। তুফানীর বাবা যতীনবাবু তাঁর নুলো হাত দুটো আকাশের দিকে তুলে বললেন, 'ভগবান আছেন। জীবনে কখনও পাপ করি নি। ভগবান দুঃখ দেবেন না আমাকে।'

তুফানীরা হাওড়া চলে যাওয়াতে গৌতমের খুব কষ্ট হয়েছিল। তুফানীকে বড্ড ভালবাসত সে। তুফানী খুব সুন্দরী ছিল না। এক মাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ছিল তার। চোখ দুটো ছিল জীবন্ত। আর অনর্গল 'কথা বলত। কত রকম গল্প যে বলত সে গৌতমকে। এত অনর্গল বলে যেত যে তার গল্পের খেই ধরতে পারত না গৌতম। বুঝলে গৌতমদা—একটা গল্প শোন। এক ছিল রাজা। কি সুন্দর চেহারা। আর কি ভীষণ ভাল সে। তার একটা এরোপ্লেন ছিল—আর সে এরোপ্লেনে পাড়ার সব ছোট ছোট ছেলেদের তুলে নিত। কি মজা হত যে। এই ধরনের গল্প সব। গৌতম একটা মোটরের গ্যারাজে কাজ করত। সন্ধ্যার পর যখন ফিরে আসত তখন মাঝে মাঝে তুফানী আসত। একদিনের কথা মনে আছে। এসে বাইরের খাটটায় শুয়ে আছে সে সন্ধ্যাবেলা। তুফানী এসে হাজির হল।

'শুয়ে আছ কেন গৌতমদা, লুডো খেলবে না?'

'বড্ড ক্লান্ত আজ আমি। সমস্ত দিন মোটরের তলায় শুয়ে শুয়ে কাজ করতে হয়েছে। হাত-পা ব্যথা করছে?'

'টিপে দেব ?'

তুফানী ছোট ছোট হাত দিয়ে পা টিপে দিয়েছিল তার। এমনি নানারকম মধুর স্মৃতি জমা হয়ে আছে গৌতমের মনে। আর একটা যে স্মৃতি তার মনে আঁকা আছে তার কথা সে কাউকে বলে না। তার ছোট বোন রূপোর কথা। বাংলাদেশ থেকে যখন পালিয়ে আসছিল তখন পথেই মারা যায় রূপো। শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল। ডিপ্‌থিরিয়া হয়েছিল তার। বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। রিফিউজি ক্যাম্পে এসে তার বাবা মা-ও মারা গেল কলেরায়। তারও কলেরা হয়েছিল। সে মরে নি। হরিবিলাস বাবু তার দেশের লোক। তিনিই আশ্রয় দিয়েছেন তাঁকে। মোটর কারখানায় কাজও জুটিয়ে দিয়েছেন তিনি। সেখানেই সারাদিন কাজ শেখে। সন্ধ্যাবেলা ফিরে হরিবিলাস বাবুর বৈঠকখানায় (মানে, বাইরের ছোট ঘরটায়) শুয়ে পড়ে।

না, গৌতমও বড়লোক নয়। অতি কষ্টে দিন চলে তার। তবু সে তুফানীকে বলেছিল, তোমাকে আমি খু-উ-ব সুন্দর একটা রবারের হাতী কিনে দেব। এখনও কিনে দিতে পারে নি। খু-উ-ব সুন্দর রবারের হাতির দাম আড়াই টাকা। অত টাকা জমিয়ে উঠতে পারে নি গৌতম।

তুফানীরা চলে যাবার পর একদিন গিয়েছিল সে তুফানীদের বাড়ি। অতি জঘন্য বস্তি সেটা। হাওড়া থেকে বেশ দূরে। হাওড়া ময়দান থেকে প্রায় মাইল তিনেক হবে। সে গিয়েছিল তবু একদিন। বড্ড মন কেমন করত তুফানীর জন্যে। যাওয়া মাত্রই তুফানী বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করল—'গৌতম দা আমার হাতী আন নি ?'

'যাঃ, ভুলে গেছি। আসছে রবিবার আমি আসব। তখন নিয়ে আসব ঠিক।'

সেই রবিবার সমুপস্থিত কিন্তু ক্রমাগত বৃষ্টি পড়ছে। হাতীও কিনতে পারে নি গৌতম। পয়সা জোটে নি।

তবু সে ঠিক করে ফেলল—যাবে। তুফানীকে যখন কথা দিয়েছে নিশ্চয় যাবে সে।

গৌতম থাকে দমদমে। যেতে হবে হাওড়ায়। ক্রমাগত বৃষ্টি পড়ছে, খালি গায়ে একটা ছেঁড়া হাফপ্যান্ট পরে' বেরিয়ে পড়ল গৌতম। যা থাকে কপালে!

রাস্তায় বেরিয়ে দেখে সি. আই. টি. রোডে এক হাঁটু জল। আর সারি সারি অচল মোটর দাঁড়িয়ে গেছে। মোটরের ডিস্ট্রিবিউটারে জল ঢুকলে মোটর থেমে যায় এটা সে জানে। দেখলে রাস্তায় কয়েকটা ছোঁড়া দাঁড়িয়ে গেছে। ডিস্ট্রিবিউটার পুঁছে মোটর স্টার্ট করে দিচ্ছে আর মোটর পিছু এক টাকা করে রোজগার করছে। গৌতমও লেগে পড়ল। ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই পাঁচ টাকা রোজগার করে ফেলল সে। বৃষ্টি-বাদল করেছেন বলে এতক্ষণ সে ভগবানকে গাল দিচ্ছিল। এবার মনে মনে প্রণাম করতে লাগল। বৃষ্টি না হলে তো হাতী কেনবার টাকাটা রোজগার করতে পারত না। ছুটল সে মানিকতলা বাজারের সেই দোকানটার উদ্দেশ্যে যেখানে রবারের হাতীটা আছে, যার পেট টিপলেই ক্যাঁক ক্যাঁক শব্দ হয়, যার পেটের ছ্যাঁদায় গোল ধরনের একটা বাঁশী আছে।

সেখানে গিয়ে কিন্তু হতাশ হল গৌতম।

দোকান বন্ধ। আজ রবিবার।

দোকানের ঠিক নীচেই একটা আম-ওলা বসেছিল। তার রবিবার সোমবার নেই, রোজই সে দোকান খুলে বসে থাকে। পাটনায় বাড়ি। তাকেই জিগ্যেস করলে গৌতম—দোকানটা কখন খুলবে?

'সোমবার বেলা তিন বাজে।'

সত্যিই বড় হতাশ হয়ে পড়ল গৌতম।

'দোকানদার কোথায় থাকে জান?'

'দুতলা মে।'

দুতলায় যাবার সিঁড়িটা কোনদিকে তাও বাতলে দিলে আম-ওলা।

দোতলায় উঠে কড়া নাড়তে লাগল গৌতম।

বেরিয়ে এল একটি ছোট ছেলে।

'আমি তোমাদের দোকান থেকে রবারের হাতী কিনব একটা—'

'আজ দোকান বন্ধ। কাল এসো। বিকেলে—'

'আমার আজ এক্ষুনি চাই—'

'কি ব্যাপার—'

স্যাণ্ডাল টানতে টানতে বেরিয়ে এল এক ছোকরা। আর তার পিছনে তার মা। সব শুনে ছোকরা বলল—'আজ তো দোকান খোলা ইম্‌পসিব্‌ল। আইন নেই।'

গৌতম দেখলে মিথ্যা ভাষণ ছাড়া উপায় নেই। সে বড় একটা মিথ্যা কথা বলে না। তবু বানিয়ে বললে—'আমার বোন আজ চলে যাবে। কাল আর থাকবে না। তার ওই রবারের হাতীটা কেনবার খুব ইচ্ছে। দয়া করে আজই দিন ওটা—'

মা সুপারিশ করলেন।

'দে না বাবা। বোনকে দেবে বলেছে—দে। হলই বা রবিবার! কর্তা যখন ছিলেন তখন তো রোজ দোকান খুলতেন।'

'চলুন, চলুন'

অনিচ্ছা সহকারে নেমে এল ছোকরা। বার করে দিলে রবারের হাতীটা। উৎফুল্ল হয়ে পেটটা টিপে দিল গৌতম। শব্দ হল—ক্যাক্, ক্যাঁক।

কি খুশীই যে হবে তুফানী।

বেরিয়ে দেখল বাস নেই। হাঁটতে হাঁটতেই এগুতে লাগল হাওড়ার দিকে। কিছু দূর গিয়ে দেখতে পেল একটা জিপ গাড়ি জল ছিটোতে ছিটোত এগিয়ে আসছে। ড্রাইভার চেনা। তাদের

গ্যারাজেই নিয়ে যায় গাড়িটা সারাতে। হাত তুলতেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কোথা যাচ্ছ—।'

'স্ট্র্যাণ্ড রোড।'

'আমাকে হাওড়া পৌঁছে দেবে ভাই।'

'হাওড়া ব্রীজের মুখে নামিয়ে দিতে পারি।'

'বেশ, তাই দাও—'

সেখানে পৌঁছে রিক্সা পেল একটা। সে-ই তাকে কদমতলা পর্যন্ত পৌঁছে দিল। তারপর আর যেতে চাইল না। চারিদিকে জল আর কাদা। আবার হাঁটতে শুরু করল। কাদায় আর জলে মাখামাখি হয়ে গেল বেচারা।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে সে যখন তুফানীদের বস্তিতে পৌঁছল তখন বিকেল হয়ে গেছে। দেখে চারিদিকে জল আর জল। যেন একটা বান এসেছে। তারপর যা শুনল তাতে তার শরীরের রক্তও যেন জল হয়ে গেল।

তুফানীদের মাটির ঘরটা না কি বর্ষায় পড়ে গেছে। তার তলায় চাপা পড়েছে তুফানী আর তুফানীর বাবা মা। মাটি আর ইঁটের স্তূপ পড়ে আছে একটা। আর তার চারিদিকে জল। পুলিস এখনও আসে নি।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গৌতম।

তারপর হাতীটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে সেই স্তূপটার দিকে। সেটা জলে পড়ে ভাসতে লাগল। তারপর একটা অদ্ভুত কাণ্ড হল। ডুবে গেল হাতীটা।

রবারের হাতী, ডোববার কথা নয়। কিন্তু ডুবে গেল। হয়তো তার ঠোঁটের ছ্যাঁদা দিয়ে তার মধ্যে জল ঢুকল—কিম্বা হয়তো আর কিছু—কিন্তু ডুবে গেল হাতীটা।

গৌতমের মনে হল তুফানীই যেন নিয়ে নিলে ওটা।

গুল গল্প

[দৃশ্য ফুটপাথ। ফুটপাথের উপর বসে আছে গুল। কুচকুচে কালো রং, থলথলে মোটা, প্রৌঢ়া। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। পরণে টকটকে লাল ঘাগরা, ঘোর নীল ব্লাউস। পায়ে একজোড়া রংচঙে স্যাণ্ডেলও পরে আছে সে। চোখদু'টি জ্বলন্ত ভাঁটার মতো। সর্বদা ঘুরছে। পাশে একটি ঝাঁটা।

লাঠিতে ভর দিয়ে কুব্জ গল্পের প্রবেশ। সে এসে ধপাস করে গুলের গা ঘেঁসে বসে পড়ল। শুধু বসল না, আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হেসে চাইল গুলের দিকে।]

আ মর মুখপোড়া, কে রে তুই! সরে বোস।

(আর একটু ঘেঁসে বসল এবং গান গেয়ে উত্তর দিল—)

আমি সরব বসে আসিনি সই
মরব বলে এসেছি,
সোজা হয় না আমার কোমর
তবু ভালবেসেছি।
মানে, দারুণ ভাবে ফেঁসেছি!

তাই না কি! ক'ঘা ঝাঁটার বাড়ি খেতে পারবি? আমার সঙ্গে অনেক ড্যাকরাই পীরিত করতে এসেছে, কিন্তু ঝাঁটার চোটে পালিয়েছে সবাই। কেউ টিকতে পারেনি, তুইও পারবি না। সরে বোস। ঘেঁসে বসছিস কেন?

এইবার কাজের কথা শোন। সিনেমায় নায়িকা হবি? নগদ দশহাজার টাকা দেবে তারা।

(সবিস্ময়ে) আমাকে?

হ্যাঁ, তোমাকে। আমি ছুঁলেই প্রেমময়ী নায়িকা হয়ে যাবে

তুমি, হয়ে যাবে রাজনর্তকী। তুমি যখন নাচবে তখন আমা
কেরামতিই সঙ্গৎ করবে তোমার সঙ্গে। তুমি যখন হাসবে তখ
সবাই তোমার হাসির মাণিক কুড়ুবে আঁজলা ভরে ভরে, তোমা
চোখের জল যখন ফোঁটা ফোঁটা পড়বে তা দিয়ে মুক্তোর মাল
বানাবে কাঞ্চননগরের রাজপুত্র। আমি তোমাকে ছুঁলেই এ
অসম্ভব সম্ভব হবে। আমি গল্প, আমি কি না করতে পারি—

গুল। আমার সঙ্গে ঠাট্টা হচ্ছে? তবে রে মুখপোড়া— (ঝাঁট
তুলল)

গল্প। আরে, আরে তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। আমি এখখুনি তোমা
ঝুলবদনকে গুলবদন করে দিচ্ছি। দেখ না—

[গল্প নিজের তর্জনী আঙুলটি গুলের কপালে ঠেকিয়ে দিতে
অদ্ভুত পরিবর্তন হল তার। আবলুস রং হয়ে গেল গোলাপী র
বুড়ী হয়ে গেল ছুঁড়ি। গোল গোল ভাঁটার মতো চোখদুটো হ
গেল পদ্মপলাশলোচন আর তাতে এমন কটাক্ষ ফুটে উঠল
একটা ষাঁড় দাঁড়িয়ে গেল তার কাছে]

গুল। একি কাণ্ড করলে তুমি! আমার যে নাচতে ইচ্ছে করছে।

গল্প। নাচ না। রাজনর্তকী হয়ে তোমায় নাচতেই তো হবে
এতদিন কতো দাঁতের ছেতো পরিষ্কার করেছ, কত উনুনে আ
দিয়েছ, কত লোককে ধাপ্পা দিয়েছ। এবার নাচ।

গুল। তুমি নাচবে না?

গল্প। আমার কোমর দোমড়ানো, আমি কি নাচতে পারি?

গুল। ভুরু তো দোমড়ানো নয়। ভুরু নাচাও।

গল্প। বেশ, তাতে রাজি আছি।

গুল। কোথায় যাব এবার?

গল্প। প্রডিউসারের কাছে। সেই তো টাকা দেবে।

গুল। চল তাহলে নাচতে নাচতে যাই।

গল্প। বেশ।

গুল নাচতে নাচতে এগিয়ে চলল। আর গল্প চলল তার পিছু-পিছু ভুরু নাচাতে নাচাতে। এরপর পরদা ধীরে ধীরে নেমে এল]

পট পরিবর্তন

একটি সিনেমার সম্মুখভাগ। ঠেলাঠেলি ভীড়। হাউস ফুল, বাইরে তবু প্রচণ্ড ভীড়। সিনেমার সামনে গুলবদনীর বিরাট রঙীন ছবি। তার নীচে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা—রাজনর্তকী।

আলো-আঁধারিতে

দীপার চিঠি পেয়ে গেলাম। লিখেছে আজ সন্ধ্যের পর আমার বাসায় আসবে। দর্শন ওর এম. এ. পরীক্ষার বিষয়। আমি ওর দাদার বন্ধু। দর্শনশাস্ত্রে বছর পাঁচেক আগে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলাম এই অপরাধ। সুতরাং দীপাকে পড়াবার ভার নিতে হয়েছে। এতদিন ওর বাড়িতে গিয়েই পড়াতাম। আজ লিখেছে আমার বাসায় আসবে। সেরেছে। ওই পেত্নীটা আমার ঘাড়ে চাপবে নাকি। কুচকুচে কালো, দাঁত উঁচু, চোখ-বসা, বিয়ের বাজারে প্রত্যাখ্যাত ওই মালটি শেষে আমাকে ডোবাবে না তো! বারবার সহজ করে আমার কাছে আসছে, ওর মতলবটা কি? আমার বাসায় আসবে? আমার বাসা মানে ওয়ানরুম ফ্ল্যাট একটা। হঠাৎ আমার টেবিল ল্যাম্পটার দিকে চেয়ে দেখলাম রং-চটা একটা এনামেলের 'শেড' রয়েছে। কেন জানিনা মনে হল দীপা এটা দেখলে আমার আত্মসম্মানে ঘা লাগবে। আমার নিজের দৈন্য ওর কাছে প্রকাশ করতে কেমন যেন সঙ্কোচ হচ্ছে। জানি ও আমার সব খবর রাখে—তবু সৌখীন 'শেড' কিনে আনলাম একটা। পয়সাটা বৃথা খরচ হল। সন্ধ্যাবেলা ইলেকট্রিক আলোই জ্বলল না আমাদের অঞ্চলে। দীপা এল। মোমবাতি জ্বালালাম একটা। বললাম

তোমার জন্যে একটা ভাল 'এসে' (essay) বেছে রেখেছি। টুকে নাও সেটা। মোমবাতির আলোর সামনে বসে দীপা টুকতে লাগল আমি অন্ধকারে ঘরের কোণের ক্যাম্প চেয়ারটায় শুয়ে দেখতে লাগলাম তাকে। আনত নয়নে একাগ্র হয়ে টুকে যাচ্ছে, অধরে নয়নে না-বলা অভিমান যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। আলো-আঁধারির পটভূমিকায় এক দীপ্তিময়ী দীপা যেন নীরবে বলতে লাগল আমার চেহারার জন্যে আমি দায়ী নই, আমার কর্মের জন্য আমি দায়ী। আমি কখনও বিপথে যাইনি, কোনও পরীক্ষায় সেকেণ্ড হইনি। মোমবাতির আলোয় এই নূতন দীপার দিকে চেয়ে অনুকম্পায় আমার মন ভরে গেল। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

সেরেছে!

রামসেবক

রামসেবক রায় শেষকালে একটা অসাধারণ কাজ করিয়া ফেলিলেন, যদিও তিনি অসাধারণ লোক ছিলেন না। মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের ছেলে, বাঙালী সমাজের সুসংস্কার-কুসংস্কার, ভালো-মন্দের মধ্যেই মানুষ তিনি। তাঁহাদের বাড়িতে নারায়ণের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পিতলের যে মূর্তি ছিল তাহার নিত্য পূজা হইত এবং রাম সেবক সে মূর্তিকে নিত্য প্রণাম করিতেন। নারায়ণে ভক্তিও ছিল তাঁহার। নারায়ণের সম্মুখে বসিয়াই তিনি প্রত্যহ দুই বেলা ভক্তিভরে আহ্নিক করিতেন। যৌবনে একটি বিষয়ে কেবল তিনি সামান্য একটু বিপথে গিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্বে তিনি মণ্টুর প্রেমে পড়িয়াছিলেন। মণ্টু অবশ্য পাড়ারই মেয়ে, স্বজাতি এবং পাল্‌টি ঘর ছিল। সুতরাং বিশেষ অসুবিধা কিছু হয় নাই।

রামসেবক বিদ্যালয়ের ভাল ছেলে।

তখন ইংরেজের আমল। একটি ভালো চাকরির জন্য দরখাস্ত

করিয়াছিলেন, কিন্তু পান নাই। ঠাকুর-দেবতাকে মানত করিয়াও পান নাই। সাহেব তাঁহার এক মোসায়েবের ছেলেকে সে কাজে বাহাল করিলেন।

কেরানীগিরি করিতে করিতে কোনরকমে ঘসটাইয়া ঘসটাইয়া শেষ জীবনে তাঁহার বেতন দুইশত টাকা হইয়াছিল। গৃহ-দেবতা নারায়ণকে বহু স্তব-স্তুতি করিয়াও তিনি তাঁহার অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন নাই। আটটি ছেলে-মেয়ে হইয়াছিল। তিনটি মারা গিয়াছে। চিকিৎসার কোন ত্রুটি করেন নাই, নারায়ণকেও বহু আরাধনা করিয়াছিলেন। তবু তাহারা বাঁচে নাই। একজন মারা গেল ধনুষ্টঙ্কারে, আর একজন কলেরায়, তৃতীয়টি টাইফয়েড জ্বরে। ডাক্তারদের চিকিৎসা ব্যর্থ হইল, নারায়ণও কোন দয়া করিলেন না।

চাকরি হইতে রিটায়ার করার পর আর একটি বাসনা রামসেবকের মনে জাগিয়াছিল। স্থানীয় মিউনিসিপালিটির কমিশনার হইবার জন্য ভোট যুদ্ধে তিনি অবতরণ করিয়াছিলেন। বহু অর্থব্যয় হইয়াছিল, একজন পুরোহিত নিয়োগ করিয়া নারায়ণকে প্রত্যহ তুলসী দিবার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে জিতিতে পারেন নাই। মাতাল এবং দুশ্চরিত্র গোলকবাবুই নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

অবশেষে রামসেবকের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। প্রথামতো পুত্রকন্যারা তাঁহার বিছানায় বসিয়া তাঁহাকে হরিনাম শুনাইতে লাগিল।

সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন রামসেবক—'চোপ্ রও'।

জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিল—'বাবা নারায়ণের মূর্তিটা কি আপনার চোখের সামনে ধরব'।

'চোপ্ রও'।

ছেলেরা হকচকাইয়া থামিয়া গেল।

মণ্টু তাঁহার শিয়রে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছিল। রামসেবক বলিলেন—'তুমি সামনে এস। তুমি সামনে এস—'

মন্টু সামনে আসিতেই তাহার হাতটা তিনি চাপিয়া ধরিলেন এবং তাহার চোখে চোখ রাখিয়াই শেষ নিশ্বাসটা ফেলিলেন।

স্থানীয় সংবাদপত্রে অবশ্য বাহির হইল রামসেবক রায় সজ্ঞানে হরিনাম করিতে করিতে সাধনোচিতধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

তুচ্ছ ঘটনা

চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে সন্ধ্যা বেলায় আলো জ্বেলে, চতুর্থ বিজ্ঞাপনটির খসড়াটা লিখছিলাম। দ্বার প্রান্তে খুট করে শব্দ হল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সে এসেছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে গেলাম। মাথায় ঘোমটা নেই, চুলগুলো রুক্ষ। মনে হল তেল পড়েনি অনেকদিন। না, শ্যাম্পু করেছে? বুঝতে পারলাম ঠিক। ঘাড়টা জেদা ঘোড়ার মতো বাঁকানো। চক্ষু আনত। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরেছে। নাকের পাতা দুটো কাঁপছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, কানে দুল দুলছে। সেই প্যাটার্নের দুল।

'একি ইল্‌শি, কি কাণ্ড, এতদিন কোথা ছিলে।'

ওর আসল নাম সুশীলা। ইলিশ মাছ খুব ভালবাসে তাই আমি ওর নূতন নামকরণ করেছি—ইল্‌শি।

ইল্‌শি ঘরে ঢুকে সামনের চেয়ারে এসে বসল। এই ঘরেই দু'মাস আগে আমরা নূতন সংসার পেতেছিলাম।

'কোথায় গিয়েছিলে ইল্‌শি—'

ইল্‌শির ঘাড় আর একটু নত হল।

'রংপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার বন্ধু বিলুদি কাজ করেন। তিনি একমাসের ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলেন, আমি তাঁর জায়গায় কাজ করছিলাম।'

'দুল কিনেছ দেখছি।'

'হ্যাঁ, নিজের রোজগারে কিনেছি। তুমি তো দিলে না। আমার এ সামান্য শখটাও মেটাতে পার নি।'

'তখন হাতে টাকা ছিল না যে। সাতদিন পরে প্রকাশক টাকা দিলে। টাকাটা পেয়েই কিনেছি—এই দেখ—।'

টেবিলের ড্রয়ার থেকে দুলের বাক্সটা বার করলাম।

'দুল নিয়ে এসে দেখি তুমি অন্তর্দ্ধান করেছ। ভাবলাম বিমানের কাছে গেছ বোধহয়। সে বড় লোক, তুমি আবদার করলে—।'

'তুমি একথা ভাবতে পারলে!'

'হ্যাঁ, মনে হয়েছিল বইকি। ইচ্ছে হয়েছিল তাকে একবার ফোন করি। কিন্তু করবার প্রবৃত্তি হল না। উপর্য্যুপরি তিনটি কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম কেবল—।'

হঠাৎ দেখলাম ইল্‌শির চোখে জল টলমল করছে। তারপরই সে ভেঙে পড়ল। টেবিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

'কাঁদছ কেন—।'

'তুমি কি করে ও কথা ভাবতে পারলে—।'

আমার মনে হল এখন—কিন্তু ওই হাই পাওয়ার বাল্‌বের আলোটা যেন প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। কি করি?

এমন সময় ইলেকট্রিক কম্পানি দয়া করলেন। আলোটা নিবে গেল।

শতাব্দীর ব্যবধান

১৮৭২ সাল।

ডাক্তার নিত্যানন্দ সেন রাত্রি দশটার সময় ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন। কাপড় জামা ছাড়িয়া খাইতে বসিবেন এমন সময় বাহিরের দুয়ারে আর্ত্তকণ্ঠে কে যেন হাঁক দিল—

—"ডাক্তার বাবু"—

বাহির হইয়া দেখিলেন রামপুরের গোপীবাবু দাঁড়াইয়া আছেন।

"আমার ছেলেটি জ্বর হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে, দয়া করে যদি—"

"যাব বইকি, চলুন—"

তখন গরুর গাড়ী চড়িয়া প্র্যাকটিস করিতে হইত। রামপুর গ্রাম এক ক্রোশ দূরে।

গরুর গাড়ী চড়িয়া ডাক্তার সেন যখন রোগীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, রোগী তখন মারা গিয়াছে।

ডাক্তার বাবু "ফি" লইলেন না।

১৯৭২ সাল।

ডাক্তার নিত্যানন্দ সেনের পৌত্র ডাঃ পি সেন বিদেশী বহু ডিগ্রী অর্জন করিয়া মহা সমারোহে কলিকাতায় প্র্যাকটিস করিতেছেন। তাঁহার চেম্বারে একদিন উক্ত গোপীবাবুর পৌত্র আসিয়া হাজির।

বলিলেন—"আমার স্ত্রী মর-মর। আপনাকে ডাকতে এসেছি। আপনার ঠাকুরদা নিত্যানন্দবাবু আমাদের বাড়ীর ডাক্তার ছিলেন— আমাদের বড় আপনজন ছিলেন তিনি—"

ডাক্তার পি সেন ডায়েরি দেখিয়া বলিলেন, "আমি সাতদিনের আগে আপনাকে সময় দিতে পারছি না।"

"আমার স্ত্রী যে মর-মর—"

"সরি, কান্‌ট হেল্‌প। অন্য কাউকে নিয়ে যান।"

শ্রাগ করিলেন।

মহারাজা মহীপতি

তোমরা গল্প শুনতে চাও?

গল্প একটা বলতে পারি কিন্তু সেটা তোমরা বিশ্বাস করবে না বোধহয়। তোমরা, আজকালকার ছেলেমেয়েরা, বড্ড বেশী চালাক-চতুর হয়ে গেছ। তোমরা বলবে এ অসম্ভব, এরকম হয় নাকি। অসম্ভব গল্পই বলতে হবে? বেশ শোন তবে।

অনেক-অনেক দিন আগে মহীপতি নামে এক রাজা ছিলেন। বিরাট তাঁর সাম্রাজ্য। প্রচণ্ড তাঁর প্রতাপ। তাঁর বিশাল প্রাসাদ অপরূপ স্ফটিক দিয়ে তৈরী। দিনের আলোয় তার এক রূপ, রাতের অন্ধকারে আর এক রূপ। তাঁর মহীসাগর দিঘি সাগরেরই মতো। কূল দেখা যায় না। অসংখ্য তাঁর কর্মচারী, পাত্র, মিত্র, সেনাপতি, উপমন্ত্রী মন্ত্রী—তাঁর ভয়ে তটস্থ। যখন কাউকে দণ্ড দেন, তখন তাকে প্রাণদণ্ড দেন। দিনের বেলায় যখন বিচারাসনে বসেন তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপে অপরাধীরা। কারণ তাঁরা জানে অপরাধ প্রমাণ হলেই শূলে চড়তে হবে। মিথ্যাবাদী, চোর, প্রতারক, চরিত্রহীন—সকলেরই এক দণ্ড। তিনি বলতেন মন্দকে মুছে ফেলো। ওর সঙ্গে আপোস কোরো না। এই মহীপতি রাত্রে কিন্তু অন্যরকম মানুষ হয়ে যেতেন। সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার সঙ্গে সঙ্গে এই দোর্দণ্ড প্রতাপ নিষ্ঠুর রাজা করুণাময় কবি হয়ে যেতেন। তখন তিনি নিজের বাগান বাড়িতে একা বসে থাকতেন। কখন গান করতেন, কখনও কবিতা লিখতেন, কখনও চুপ করে বসে থাকতেন। বিয়ে করেন নি। দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনেই পূর্ণ ছিল তাঁর রাজপুরী। তাদের খাওয়া পরার সমস্ত খরচ তিনিই দিতেন, রাজকোষে অর্থের অভাব ছিল না। কিন্তু তিনি কারো সঙ্গে মিশতেন না। নিরাপদ

একক জীবনযাপন করতে ভালবাসতেন তিনি। বেশীর ভাগ সময়ই থাকতেন তাঁর বাগানবাড়িতে প্রভাতবর্মার তত্ত্বাবধানে। প্রভাতবর্মা ছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী।

সেদিন পূর্ণিমা।

জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে দিগদিগন্ত। গভীর রাত্রি। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। উদ্যানের বেলি-কুঞ্জে এক মর্মর আসনের উপর চুপ করে বসে আছেন মহীপতি আকাশের দিকে চেয়ে। প্রকাণ্ড একটা সাদা স্তূপ মেঘ বিরাট মহিমায় রূপায়িত হয়েছে তাঁর চোখের সামনে। মেঘের সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্না লুটিয়ে পড়ছে, মনে হচ্ছে যেন বেল ফুলের পর্বত একটা। মহীপতির মনের নেপথ্যে একটা বাসনা জাগল, আহা, আমি যদি মেঘ হতে পারতাম। তন্ময় হয়ে চেয়ে ছিলেন তিনি মেঘের দিকে। এমন সময় এক তীক্ষ্ণ তীব্র চীৎকার বিঘ্নিত করল সেই নিস্তব্ধতাকে। মহীপতি উঠে পড়লেন। দৌবারিককে ডেকে বললেন—দেখে এস কে চীৎকার করছে। যদি তার দেখা পাও ডেকে নিয়ে এস এখানে।

একটু পরে দৌবারিক যাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন মহীপতি। ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার একটি বৃদ্ধা। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ, মাথার চুল রুক্ষ।

'কে তুমি?'

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল বৃদ্ধা।

তারপর প্রশ্ন করল—'আপনি কে?'

'আমি মহীপতি।'

'ও আপনিই মহারাজ মহীপতি! আমি আপনার কাছেই এক আর্জি নিয়ে এসেছি মহারাজ।'

'কি আর্জি?'

'আমাকে শূলে দিন। আমার স্বামীকে আপনি শূলে দিয়েছেন,

তিন ছেলেকেও শূলে দিয়েছেন। আমাকেও শূলে দিন। আমি আর এ কষ্ট সহ্য করতে পারছি না—'

'আমি নিরপরাধকে শাস্তি দিই না।'

'আমি গরীব। এইটাই আমার অপরাধ। আমার স্বামীও গরীব ছিল, মূর্খ ছিল, সৎপথে থেকে সে আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাতে পারে নি। তাই ডাকাতি করত। আমার ছেলেরাও ডাকাত হয়েছিল। আমাদের মতো গরীবরা আপনার রাজত্বে সৎপথে থেকে উপার্জন করতে পারে না। সবাই অসৎ, কেউ ধরা পড়ে, কেউ পড়ে না। আমি অসমর্থ, তাই আমি চুরি ডাকাতি করতে পারি না। তবু আপনি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিন মহারাজা, আমি এ কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না।'

মহীপতি বললেন—'তোমাকে আমি প্রচুর ধনসম্পত্তি দিচ্ছি। তোমার কোনও কষ্ট থাকবে না।'

'কিন্তু আপনার প্রচুর ধনসম্পত্তি কি আমার মনের আগুন নেবাতে পারবে? অশান্তির আগুন, শোকের আগুন জ্বলছে আমার মনে। এখন বেঁচে থাকা মানেই কষ্টভোগ করা, আমাকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দিন মহারাজ। দোহাই আপনার—'

মহীপতির পায়ের উপর মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল বুড়ীটা। মহীপতি বললেন—'না, আমি কিছুতেই নির্দোষকে শাস্তি দিতে পারব না।'

'তাহলে আমি আপনার সামনেই আত্মঘাতী হব।' এই বলে বুড়ি সেই মর্মর-বেদীর উপর ক্রমাগত মাথা ঠুকতে লাগল। মহীপতি দৌবারিককে আদেশ দিলেন—'এই বুড়ীকে সরিয়ে নিয়ে যাও এখান থেকে।'

বুড়ী কিন্তু এত জোরে জোরে মাথা ঠুকছিল যে তার মাথা ফেটে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হল তার। একটু পরেই লোকজন এসে সরিয়ে নিয়ে গেল তার মৃতদেহটা।

মহীপতি নিস্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন।

নির্নিমেষে চেয়ে দেখছিলেন আকাশের সেই বিরাট স্তূপ মেঘটার দিকে। সেটা আর সাদা ছিল না, কুচ্‌কুচে কালো হয়ে গিয়েছিল। আর তার ভিতর থেকে ক্ষণেক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। তারা যেন মহীপতিকে বলছিল—'মহীপতি তুমিও পাপী। তোমারও শাস্তি দরকার।'

প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ বসেছিলেন মহীপতি।

তাঁরও মনে হচ্ছিল—তিনি শুধু পাপী নন, মহাপাপী। তিনি প্রজাদের সুখী করতে পারেন নি, কেবল শোষণ ও শাসন করেছেন। তাঁরও মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য।

ঠিক করে ফেললেন তিনিও আত্মঘাতী হবেন। তিনি মহা অপরাধী। নিজের মৃত্যুদণ্ড নিজেকেই দেবেন।

মহীসাগরের যে অঞ্চলে প্রচুর কুমুদ ফুল ফোটে সেই অঞ্চলে জলের ধারে কতকগুলো পাথরও পড়ে আছে ইতস্তত। মহীপতি একটা থলি নিয়ে সেইখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ঠিক করেছিলেন একটা বড় পাথর থলিতে পুরে গলায় বাঁধবেন সেটা, তারপর জলের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। মহীসাগরের জলে ডুবে মরবেন তিনি। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল সাতরঙের সাতটা মেয়ে মহীসাগরের কুমুদ বনে জলকেলি করছে। কেউ লাল, কেউ নীল, কেউ জরদা, কেউ হলুদ, কেউ সবুজ, কেউ শ্যামলা, কেউ বেগুনী। অপরূপ সুন্দরী সাতটি কিশোরী। মহীপতিকে দেখেই এগিয়ে এল তারা।

'এ কি মহারাজা, আপনিও এসেছেন! আসুন, আসুন। ও কি আপনার হাতে থলি কেন?'

মহীপতি জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমরা কে?'

'আমরা সাতটা রং। দিনের বেলা সূর্যালোকের মধ্যে লুকিয়ে থাকি। জ্যোৎস্নারাত্রে মাঝে মাঝে আপনার এই দীঘির কুমুদ বনে

চলে আসি। চমৎকার এ জায়গাটি। আপনি থলি নিয়ে এসেছেন কেন, ফুল তুলবেন ?'

মহীপতি তখন সব কথা খুলে বললেন তাদের।

তারা সমস্বরে বলে উঠল—'আত্মহত্যা করবেন, সে কি ! কেন ?'

'আমি মহাপাপী।'

'আপনার যখন অনুতাপ হয়েছে তখন পাপ তো আর নেই। মিছিমিছি আত্মহত্যা করবেন কেন। বরং আপনি বেঁচে থেকে প্রজাদের মঙ্গল করুন।'

'প্রজাদের মঙ্গল করা শক্ত। কারণ আমার কর্মচারীরা বেশীর ভাগই অসাধু। তারাই আমার রাজ্যশাসনের যন্ত্র। এদের নিয়ে প্রজাদের মঙ্গল করা যায় না।'

'এদের তাহলে দূর করে দিন। ভালো লোক বাহাল করুন!'

'তাতে বড় হাঙ্গামা। অত ঝক্কি পোয়াতে আমি পারব না। তবে তোমরা যদি আমার সঙ্গে যাও, আমার শাসনভার তোমাদের হাতে দেব। যাবে ?'

'আমরা ? আমরা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছি। আমরা কি আপনার রাজপুরীতে আটক থাকতে পারি ?'

মহারাজ আবার অনুরোধ করলেন।

'না, না চল তোমরা। আমার মেয়ের মতো থাকবে আমার কাছে।'

কিন্তু গেল না তারা। হঠাৎ সাতটি রঙীন পাখীতে রূপান্তরিত হয়ে উড়ে গেল তারা আকাশের দিকে।

মহীপতি উর্ধ্বমুখ হয়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর থলিটি গলায় বেঁধে একটি বড় পাথর তার ভিতর পুরে জলে নামতে যাচ্ছেন, এমন সময় দেখলেন, একটি দিব্যকান্তি পুরুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

'মহীপতি তুমি মরতে যাচ্ছ ? কেন ?'

'আপনি কে?'

'আমি বরুণ দেব। তোমার মহীসাগরে আমি প্রতি পূর্ণিমা রাত্রে আসি। কিন্তু তুমি এ কি করছ!'

'আমার সংসারে থাকবার ইচ্ছে নেই। রাজ্য শাসনে অপারগ। এখনি সাতটি পরী দেখলাম, তাদের সাহচর্যে ভারি আনন্দ পেয়েছিলাম আমি। কিন্তু তারা রইল না।'

বরুণদেব বললেন—'তারা তো সাতটি রং। মহাশিল্পী ভগবানের চিত্রশালায় তাদের অহরহ দরকার। তারা তোমার কাছে থাকবে কি করে? তুমি যাও ভালভাবে রাজ্যশাসন কব গিয়ে—।'

'আমি পারব না। আমার মনে হয় প্রজারা নিজেরাই নিজেদের মঙ্গলের ব্যবস্থা করবে ভবিষ্যতে। আমি সরে থাকতে চাই। আমাকে একটি বর দিন প্রভু।'

'কি বর চাও?'

'আমি ওই সাতটি রঙের কাছে থাকতে চাই—'

'বেশ। তাহলে আকাশের খানিকটা অংশ হও। ওরা যখন রামধনু হয়ে ফুটবে, তুমি ওদের কাছে থেকো।'

সেদিন থেকে মহীপতি আকাশের সঙ্গে মিশে গেলেন। রামধনুর ঠিক পিছনে যে আকাশ আছে—সে-ই মহীপতি। মহারাজা মহীপতি এখন মহাশূন্যের একটা অংশ।

মুন্না সাহেবের গল্প

মুন্না সাহেব বৃদ্ধ লোক। মুখে মন-মহেশ পাকা দাড়ি। কিন্তু দাড়ির রং সাদা নয়। কখনও সবুজ, কখনও মেহেদি, কখনও কুচ্‌কুচে কালো। দাড়িতে রং মাখান তিনি। পরেন লম্বা জোব্বা আর পায়জামা। সেগুলোও রঙীন। বড়লোক। বিয়ে-থা করেন নি। আত্মীয়স্বজনও বিশেষ কেউ নেই। দেশ ভ্রমণ করে বেড়ান। পৃথিবীর

সর্বত্রই প্রায় গেছেন। আব গল্প বলতে পাবেন খুব ভালো। এদেশে তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদ শহরের এক প্রান্তে। প্রকাণ্ড মনজিলের মতো বাড়ি। বাড়ির চাবদিকে মস্ত হাতা। হাতার চারদিকে মস্ত উঁচু দেয়াল। শোনা যায় মুন্না সাহেবেব সঙ্গে নবাব ওয়াজেদ আলির কি একটা সম্পর্ক ছিল যেন। তাঁব বসবার ঘরে প্রকাণ্ড একটা সোনাব গড়গড়া একটা গ্লাস-কেসে সযত্নে রাখা আছে। এটা নাকি ওযাজেদ আলি তাঁর পূর্বপুরুষ আবিদ আলমকে উপহাব দিয়েছিলেন। গড়গড়াটির নীচে প্রকাণ্ড একটি হীরে ছিল। আলম সাহেব কয়েক লক্ষ টাকায় বিক্রি কবেছিলেন সেটি। এই বকম নানা কাহিনী শুনতে পাওয়া যায ফুকন মিঞাব কাছে। ফুকন মিঞা মুন্না সাহেবেব বাল্যবন্ধু। মুন্না সাহেব যখন বিদেশে বেড়াতে বেরোন তখন তাঁর মুর্শিদাবাদের বাড়িটার দেখাশোনা করেন ফুকন মিঞা।

সেবার দেশভ্রমণ করে ফিরতে প্রায় বছব খানেক হযে গেল মুন্না সাহেবের। ফুকন মিঞা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কি হল মুন্নার, কোন খবরই পাচ্ছিলেন না। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন ফিরে এলেন মুন্না সাহেব।

'কি ব্যাপার, কোথায় গিযেছিলে মুন্না ?'

'জায়গাটার নাম ঠিক বলতে পারব না ফুকন। তবে মনে হয় জায়গাটা আফগানিস্তানের কাছাকাছি কোনও পাহাড়ের উপত্যকা। চাবদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় মাঝখানে খানিকটা সমতল। পাহাড় বেয়ে নেমে ছিলাম, নামতে খুব কষ্ট হয়েছিল। ভেবেছিলাম নেমে কোনও গ্রাম বা শহর পাব। কিন্তু খালি মাঠ, সবুজ মাঠ। মাঠের উপর হাঁটলাম খানিকক্ষণ। তারপর বসে পড়লাম। পা ব্যথা করতে লাগলো। চারিদিকে চেয়ে দেখি কোথাও কেউ নেই। একটু বেকায়দায় পড়ে গেলাম। অন্য অন্য জায়গায় যখন যাই তখন একটা ঘর ভাড়া করি, চাকর বাহাল করি। কিন্তু এখানে এই নির্জন জায়গায় কি করব। ক্ষিদে পেয়েছিল, কিছু খাবার পেলে হ'ত, পা

হুটো ব্যথা করছিল একটু তেল মালিশ করে দিলে আরাম পেতাম। আমার পকেটে টাকাকড়ি ছিল প্রচুর, কিন্তু এ নির্জন স্থানে মোহর আর খোলামকুচির তফাত কি। নিরুপায় হয়ে শেষে খোদা-তালাকে ডাকতে লাগলাম। হাতজোড় করে চোখ বুজে কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। হঠাৎ কে যেন বললে—বান্দা হাজির আছে, কি করতে হবে বলুন। চোখ খুলে চমকে উঠলাম। দেখি সামনে একটা প্রকাণ্ড গিরগিটির মত লোক। তার মাথায় একটা টুপি।' ফুকন্ মিঞা জিগ্যেস করলেন—'গিরগিটির মতো লোক? কি রকম?'

'আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। মানুষের মত হাত পা মুখ সব, জামা-পাজামাও পরে আছে। কিন্তু কেমন যেন লম্বা গোছের। অনেকটা ছোট কামানের মতো। কিন্তু তাতে চাকা নেই, হাত পা আছে। মুখও আছে। মানুষেরই মুখ। আর মাথায় একটা টুপি পরা। সামনের হাত হুটো বড়, পা হুটো ছোট। হাতের উপর ভর করে ঘাড় তুলে কথা বলে—'

এমন সময় মুন্না সাহেবের জিনিসপত্র নিয়ে কুলিরা এল। ফুকন্ দেখ্‌লেন মুন্না সাহেবের বাক্স বিছানা ছাড়া একটা ছোট লোহার বাক্স রয়েছে।

'বাক্সটা কিসের মুন্না?'

'পরে বলব। আগে এই লোকটার কথা শুনে নাও। আশ্চর্য লোক ও। ওকে দেখে আমি প্রথমটা ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু ওকেই শেষে বললাম—আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাবাব পাওয়া যাবে এখানে? 'এক্ষুনি এনে দিচ্ছি' বলে লোকটা তরতর করে চলে গেল গিরগিটির মতো। তারপর দেখি একটি ছিমছাম ছেলে এসে হাজির হল। তার হাতে একটি চমৎকার ট্রে। আর তাতে নানারকম খাবার সাজানো। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ছেলে এল হালকা টেবিল চেয়ার নিয়ে। টেবিলের উপর ট্রেটি রাখলে, আমি চেয়ারে বসে খেতে লাগলাম। ছেলে হুটি অন্তর্ধান করল।

কিন্তু আমার খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র আবার এসে হাজির হল তারা। টেবিল চেয়ার ট্রে সব নিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম—কে তোমরা। কোনও জবাব দিল না। একটু পরেই সেই গিরগিটির মতো লোকটা এল। এসে জিগ্যেস করলে—'খাবার পেয়েছেন?' বললাম—'পেয়েছি। বড় চমৎকার খাবার। খুব তৃপ্তি হয়েছে আমার। এসব জিনিস এখানে পেলে কোথা থেকে।' সে হেসে বলল—'বিশ্বকর্মার দরবার থেকে এসেছে খাবার।' আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—'বিশ্বকর্মার দরবার থেকে? কি রকম?' তখন সে বললে—'সব বলতে হলে, অনেককথা বলতে হয়। আপনি শুনবেন?' বললাম—'নিশ্চয়ই শুনব। ভারী কৌতুহল হচ্ছে আমার। তোমার নামটি কি জিগ্যেসই করি নি। সে বললে—'আমার নাম গর্ত। আগে এই মাঠেরই একটা অংশ ছিলাম। কিন্তু একদিন বাজ পড়ল। ছিলাম মাঠ হয়ে গেলাম গর্ত। বজ্রাঘাতে আমার আর একটা উপকার হল। আমি মানুষের মতো কথা কইতে শিখলুম। যতদিন গর্ত ছিলাম, অনেক কষ্ট পেয়েছি। এ অঞ্চলের যত ময়লা জল আর শুকনো পাতা আমার ভিতরে ঢুকে পচত। নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছিলাম। এমন সময় ভগবান একদিন দয়া করলেন। দেখলাম একটি দিব্যকান্তি পুরুষ এসে আমার ধারে দাঁড়িয়েছেন। আমি বললাম, আপনি আর এগুবেন না। আমি গর্ত। আমার ভিতরে যদি পড়ে যান কষ্ট পাবেন।' দিব্যকান্তি পুরুষটি সবিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'তুমি গর্ত? গর্ত হলেও ভাল লোক তুমি। আমাকে সাবধান করেছ। তোমারও আমি উপকার করব।' জিগ্যেস করলাম—'আপনি কে?' বললেন, আমি বিশ্বকর্মা। এই মাঠের ওপারে সুন্দর একটি সরোবর আছে। তার তীরে শচীদেবীর জন্য একটি আপাত-অদৃশ্য-নৃত্যশালা তৈরি করতে হবে। গন্ধর্ব লোকের রূপসীরা জ্যোৎস্নারাতে সেখানে এসে

নাচবেন। জ্যোৎস্নারাতেই মূর্ত হবে সেটি। যাই হোক আমার থলিতে মানুষ তৈরির কিছু মাল-মসলাও আছে। তোমাকে একটা মানুষ তৈরি করে দিচ্ছি। আমার এই চেহারা তৈরী করে দিয়ে বললেন—ঠিক মানুষের মতো হল না। যাইহোক এতে কাজ চলে যাবে। তোমার মাথাও পুরো করতে পারিনি। একটা ফুটো থেকে গেল। ওর উপর একটা টুপি করে দিচ্ছি। আর বর দিচ্ছি ওই ফুটো দিয়ে তোমার প্রাণপুরুষ পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবে। কোনও দরকার যদি হয় আমার কাছেও যেতে পার। তোমার প্রার্থনা আমি অবিলম্বে পূর্ণ করব। আপনার খাবার আমি বিশ্বকর্মার দরবার থেকে আনিয়েছি।' আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম সব। বললাম—'রাত্রে শোব কোথায়?' 'সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি'—সঙ্গে সঙ্গে গর্ত চলে গেল। একটু পরেই কয়েকজন লোক একটি সুদৃশ্য তাঁবু খাটিয়ে দিয়ে গেল মাঠের মাঝে। পালঙ্ক বিছানাও এসে হাজির হল। এমন কি একটি গড়গড়া পর্যন্ত। আমি বললাম—'তাঁবুটি চমৎকার। কিন্তু এখানে তো সারা জীবন থাকা যাবে না। বাড়ি ফিরতে হবে আমাকে।' গর্ত তৎক্ষণাৎ বলল, 'যেদিন আপনি বাড়ি ফিরতে চাইবেন, সেইদিনই আপনাকে পাহাড়ের ওপারে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব। কিন্তু যাবার আগে আপনি গন্ধর্ব-পরীদের নাচ দেখে যাবেন। পূর্ণিমার রাতে ওই মাঠের ওপারে অদ্ভুত এক ইন্দ্রপুরী তৈরি হয়। সেখানে পরীরা এসে নাচে। সেটা আপনাকে দেখতেই হবে।' থেকে গেলাম সেখানে দিন কয়েক। আর কি যে যে দেখলাম ফুকন তা বর্ণনা করবার ক্ষমতা আমার নেই। পান্নাপরী, চুনীপরী, হীরেপরী, মুক্তোপরী এই চারটি পরীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তারপর বাড়ি ফেরার সময় খন এল তখন গর্তকে বললাম যে এ চারটি পরীকে তো জীবনে আর দেখতে পাব না। তবু বাড়ি ফিরে যেতে হবে। গর্ত বলল—'পাবেন। আমি সে

ব্যবস্থাও করে' দিচ্ছি। একটি স্ফটিকের আয়না দেব আপনাকে আর একটি মন্ত্র বলে দেব। আয়নার সামনে মন্ত্র পড়লে স্ফটিকের আয়নার চেহারা বদলে যাবে। স্ফটিকের আয়না কখনও হবে পান্নার আয়না, কখনও চুনীর আয়না, কখনও হীরের আয়না, কখনও মুক্তোর আয়না—আর তার ভেতর আপনি দেখতে পাবেন কখনও পান্নাপরীকে, কখনও চুনীপরীকে, কখনও হীরেপরীকে কখনও মুক্তোপরীকে। ওই লোহার বাক্সটায় সেই স্ফটিকের আয়নাটা আছে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জান ফুকন্। দীর্ঘপথ আসতে আসতে আরবী-ফার্সির সেই মন্তরটা আমি ভুলে গেছি। কিছুতেই মনে করতে পারছি না— আমার স্মৃতিশক্তি তো বরাবরই খারাপ। এখন কি করি বল তো ফুকন্।'

ফুকন্ বললে—'কি আর করবেন, যা হারিয়ে গেছে তা আর পাবেন কি করে।'

'পেতেই হবে—'

মুন্না সাহেব এখন আরবী আর ফারসি অভিধান ওলটাচ্ছেন দিনরাত, যদি মন্ত্রটা মনে পড়ে যায়. কিন্তু পড়ছে না। •

পরদিন বোঝা গেল

অবশেষে খোদ বিধাতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। বিধাতা প্রশ্ন করলেন—'কে তুমি'

'আমি দিবাকর'

'দিবাকর? আমার সৃষ্টি দিবাকর সহস্রকিরণ, অমিত-তেজপুঞ্জ। তুমি তো দেখ্‌ছি সুঁটকো। কালো। এ নাম তোমায় কে দিল?'

'আমার ঠাকুর্দা—'

'কি চাও—'

'চাকরি'

'কি পাশ করেছ ?'

'বি এ'

'কি কি বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করেছ'

একটু থতমত খেয়ে গেল দিবাকর। ভাবল বিধাতাকে ভাঁওতা দেওয়া যাবে না। তিনি সর্বজ্ঞ।

বলল, 'আজ্ঞে কোন বিষয়েই আমি জ্ঞানলাভ করিনি। বরাবর টুকে পরীক্ষা পাশ করেছি'

'এরকম করতে গেলে কেন ?'

'আজ্ঞে চাকরির বাজারে জ্ঞানের দরকার নেই, ডিগ্রির দরকার, তাই ডিগ্রির দিকেই আমাদের ঝোঁক বেশী। অনেক টাকা খরচ করে' তাই ডিগ্রি জোগাড় করেছি একটা। কিন্তু চাকরি পাচ্ছি না। আপনি যদি একটা চাকরি জোগাড় করে দেন দয়া করে।'

'আমার তো কোনও পোর্টফোলিও নেই। পোর্টফোলিও না থাকলে চাকরি দেওয়া যায় না।'

দিবাকরের মাথা খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ।

সে ভুলে গেল কার সঙ্গে কথা কইছে।

হাতের 'পাইপ গান'টা উঁচিয়ে বলল—'চাকরি যদি না দেন তো খুন করব আপনাকে।'

বিধাতার মুখে স্মিত-হাস্য ফুটে উঠল।

বললেন, 'কেন একটা গুলি নষ্ট করবে। আমি অমর। অনাদি-কাল থেকে বেঁচে আছি, অনন্তকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকব। তুমি আকুল-ভাবে ডাকছিলে বলেই তোমার কাছে এসেছি। কিন্তু তুমি এমন জিনিস চাইছ যা আমি দিতে পারব না। পোর্টফোলিও না থাকলে চাকরি দেওয়া যায় না।'

'তাহলে কিছু একটা ব্যবস্থা করুন আমার'

'ব্যবস্থা আর কি করব। তুমি যখন মূর্খ তখন জানোয়ারদের মতো খাও দাও আর ঘুরে বেড়াও'

'কিন্তু খাব কি। ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। দু'দিনই খাইনি।'

বিধাতার ডান হাতে একটি কমণ্ডুল ছিল।

'বেশ, হাঁ কর। কিছু খাবাব দিচ্ছি'

'কি আছে ওতে ?'

'সুধা। এতে দেবতাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, এ খেয়ে তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন।'

দিবাকর হাঁ করল, বিধাতা তার মুখে সুধা ঢেলে দিলেন। দিবাকর সন্তুষ্ট হল না কিন্তু। বলল, 'কিছুই বুঝতে পারলাম না তো। কোনও স্বাদও পেলাম না, গন্ধও পেলাম না। বুঝতেই পারলাম না যে কিছু খেয়েছি'

'ওই সুধা'

বিধাতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পবদিন বোঝা গেল দিবাকর মানুষ, দেবতা নয়। কারণ সুধা খেয়ে তার ক্ষিদেও মিটল না, সে অমরত্ব লাভও করল না। দেখা গেল পরদিন তার মৃতদেহটা বাগানে পড়ে রয়েছে। রগে পাইপগানের গুলির ক্ষত।

কয়ালবাবুর ডায়েরি থেকে

পাঠক মশায়ের মনে এমন যে একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা লুকিয়েছিল তা আমিও জানতাম না। অথচ আমি এতকাল ওঁর সঙ্গে আছি! পাঠক মশাইয়ের চেহারা যে খুব সুন্দর তাও বলা যায় না। গ্যাট্রা-গোট্টা প্রৌঢ় লোক তিনি। মাথার সামনের দিকে একটু টাক। আজানুলম্বিত বাহু। মুখটি চার-কোনা। শক্ত চোয়াল, থ্যাবড়া নাক। যখন কথা বলেন মনে হয় হাঁড়ির ভিতর থেকে কথা বেরুচ্ছে। জগন্ময় পাঠকের নাম অনেকেই শোনেননি। কারণ অনেকেরই জ্ঞান সীমাবদ্ধ। সুপুরির ব্যবসা যাঁরা করেন, লোহার ব্যবসাতে যাঁরা দিক-

পাল, কাঁকরের ব্যবসাতে, হাড়ের ব্যবসাতে যাঁরা কর্ণধার তাঁরা সবাই চেনেন জগন্ময় পাঠককে। কৃতী লোক। ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান মানে আধুনিক জগতের তীর্থ স্থানগুলি কয়েকবার ঘুরে এসেছেন তিনি। জীবনকে চুটিয়ে ভোগও করেছেন। সে ভোগের বিশদ বিবরণ দিলে হয়তো শালীনতার সীমা অতিক্রম করবে তাই তা আর লিখছি না। কিছুদিন আগে পাহাড় থেকে একটি পাণ্ডা কিনে এনে পুষেছেন। একজন বিখ্যাত গুরুর কাছে মন্ত্রও নিয়েছেন সেদিন। আমার ধারণা ছিল তাঁর জীবনের সব সাধ-আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি—আমি তাঁর বশংবদ ভৃত্য কৃষ্ণকান্ত কয়াল—এতদিন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থেকেও তাঁকে পুরো চিনতে পারিনি। হাঁ, আমি তাঁর বংশবদ ভৃত্যই। তিনি আমার সব ভার নিয়েছেন, আমিও তাঁর সব ভার নিয়েছি। প্রয়োজন হলে আমি তাঁর পা-ও টিপি আবার বড় বড় ব্যবসার ব্যাপারে মন্ত্রণাও দিই। ব্যবসার ব্যাপারে তদ্বির করবার জন্যই আমাকে তিনি দিল্লী পাঠিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস আমি কাছে থাকলে এ কাণ্ডটা ঘটত না। দিল্লীতে হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম—পাঠকমশাইকে পুলিশে ধরেছে, অবিলম্বে চলে আসুন। এসে যা শুনলাম অবাক হয়ে গেলাম তাতে। পাঠক মশাই দিন-দুপুরে চৌরঙ্গীতে গিয়ে একটি যুবতী মেয়ের উপর না কি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেষ্ট করেছে তাঁকে। এ বয়সে পাঠক-মশায়ের এ দুর্মতি হওয়ার কথা নয়। কি হল বুঝতে না পেরে পুলিশ গারদে গিয়ে দেখা করলাম তাঁর সঙ্গে।

দেখা হওয়া মাত্রই তিনি আমাকে বললেন, 'এই বিশ্বম্ভরটাকে দূর করে দাও। অপদার্থ একটা—'

বিশ্বম্ভর নামক ছোকরাকে তিনি আমার সুপারিশেই বিজ্ঞাপন লেখার চাকরিটা দিয়েছিলেন। ছোকরার আসল গুণ অবশ্য ছোকরা ভালো ফোটোগ্রাফার। কথাটা শুনেছিলেন পাঠক মশাই; শুনে বলেছিলেন—আচ্ছা, দরকার হলে ওকে দিয়ে ফোটোও তোলাব।

আমি বুঝতে পারছিলাম না। এ ব্যাপারে বিশ্বম্ভরের অপরাধ কোথায়। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

পাঠক মশাই বললেন—'তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ না কিছু—'

'আজ্ঞে না'

'আমি চাই না আবার আমার পুনর্জন্ম হোক। কিন্তু কোনও আকাঙ্ক্ষা যদি অতৃপ্ত থাকে তাহলে আবার জন্মাতে হবেই। আমার সব সাধ আকাঙ্ক্ষা মোটামুটি মিটে গেছে। একটি কেবল মেটেনি। এখনও খবরের কাগজে ছবি ছাপা হয়নি আমার। এম-এল-এ হবার চেষ্টা করলুম, পারলাম না; সিনেমাতে ঢোকবার চেষ্টা করেছিলাম টাকাও দিতে চেয়েছিলাম, কোনও ডিরেক্টার আমাকে হিরো করতে চাইল না। এতবার বিলেত গেলাম, জাপানে গেলাম, তবু আমোল দিলে না আমাকে খবরের কাগজওয়ালাবা। কেউ ছবি ছাপালে না!—'

গুম হয়ে গেলেন পাঠক মশাই।

তারপর বললেন—'তারপর আমি ঠিক করলাম, খবরের কাগজে আমি ছবি ছাপাবই। গুণ্ডারূপেই ছাপা হোক, কিন্তু ছাপা হোক। বিশ্বম্ভরকে বললাম, তুমি ক্যামেরাটা নিয়ে চল আমার সঙ্গে চৌরঙ্গীতে। আমি একটা মেয়ের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ব, সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমার একটা ছবি তুলে নেবে। তারপর তুমি নিজে সব খববেব কাগজের আপিসে গিয়ে ছবিসুদ্ধ খবরটা দিয়ে আসবে। বিশ্বম্ভর কি করল জান? ঠিক সেই সময়টিতে পা পিছলে পড়ে গেল দড়াম করে। হতভাগা ওয়ার্থলেস—'

একটু থেমে আবার বললেন—'যে রকম হৈ-হৈ হয়েছিল পুলিশ আমাকে না আগলালে আশেপাশের লোকগুলোই আমাকে ছাতু করে দিত।'

বললাম—'একটা কাগজে খবর একটা বেরিয়েছে। আপনার নাম দেয়নি। লিখেছে এক দুর্বৃত্ত চৌরঙ্গীতে এক তরুণীর ওপর

লাফিয়ে পড়েছিল। ছবিও বেরিয়েছে একটা।' সোৎসুকে পাঠক মশাই প্রশ্ন করলেন—'কার ছবি?'

'সেই মেয়েটির'

'সবই অদৃষ্ট'

পাঠক মশাই কপালের উপর তর্জনী স্থাপন করলেন।

ভূতের গল্প

হঠাৎ মাখন সিং এসে হাজির হল অনেক দিন পরে। শিকারী মাখন সিং। কাঁধে বন্দুক, হাতে একজোড়া মরা পিন্‌টেল। পিন্‌টেল অতি সুস্বাদু বুনোহাঁস। মাখন অনেক বুনোহাঁস খাইয়েছে আমাকে। প্রায়ই হাঁস মেরে আনত। হরিণের মাংস, বুনো শুয়োরের মাংস, সজারুর মাংস, ফ্লরিকানের মাংস ওর দৌলতেই খেয়েছি। আমার ঘরে বাঘের যে চামড়াটা দেওয়ালে টাঙানো আছে সেটাও মাখনের দেওয়া। খুব বড় শিকারী ও। পরণে খাকি হাফ্‌ শার্ট, হাফ প্যাণ্ট। কাইজারি গোঁফ। মাথার চুল কদম ছাঁট।

অনেক দিন পরে এল আজ।

'কি মাখনলাল, এস এস। এতদিন কোথায় ছিলে?'

নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াই। ভাবলাম অনেকদিন দাদার সঙ্গে দেখা হয় নি, দেখা করে আসি। আজ ভাগ্য ভালো দুটো পেন্‌টেলও পেয়ে গেলাম।'

'বেশ, বেশ। বস। চা খাবে, না কফি?'

মাখন রহস্যময় হাসি হেসে বলল—'না, কিছু খাব না। আপনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে আছেন মনে হচ্ছে—'

'হ্যাঁ। মনে মনে কল্পনার দরবারে ধন্না দিয়েছি। একটা ভৌতিক গল্পের প্লটের জন্য।'

'আমার একটা অদ্ভুত ভূতের গল্প জানা আছে। শুনবেন?'

'বেশ বল।'

মাখন সিং বলতে লাগল।

'গৌড়ের কাছে একটা জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলাম। একজন খবর দিয়েছিলেন সেখানে ভোরের দিকে বড় বড় কালো তিতির পাওয়া যায়। খুব ভোরে বেরোয় তারা। আমি ঠিক করলাম রাতে গিয়ে বনের ধারেই শুয়ে থাকব। আমার ছোট একটি বিলিতি খাটিয়া আছে। সর্বত্র নিয়ে যাওয়া যায় প্যাক করে। তার মাপে মশারিও আছে আমার একটা। ঠিক করলাম জঙ্গলের ধারেই মশারি খাটিয়ে শুয়ে থাকব রাত্রে।

খাওয়া দাওয়া করে চলে গেলাম রাত দশটার পর। সন্ধ্যা থেকেই আমার চাকর শুকুল বিছানা করে মশারি টাঙিয়ে অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। আমি গিয়ে তাকে ছুটি দিয়ে দিলাম। সে বাসায় চলে গেল। আমি লোডেড্ বন্দুকটি নিয়ে শুয়ে পড়লাম। তখনও চাঁদ ওঠে নি। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। কিন্তু বেশ হাওয়া দিচ্ছিল। একটু পরেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ একটা ফোঁস করে শব্দ হল। মনে হল সাপ নাকি। সঙ্গে টর্চ ছিল। জ্বেলে দেখি—ও বাবা সাপ নয়, হাতী। বিরাটকায় একটা হাতী। ঠিক সেই সময়েই আকাশের মেঘটা সরে গেল। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের জ্যোৎস্নায় ভরে গেল চতুর্দিক। দেখলাম হাতী শুধু বিরাটকায় নয়, বেশ সুসজ্জিতও। পিঠে হাওদা রয়েছে। আমার মশারির ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে শুঁড় নাড়ছে, কান নাড়ছে আর ফোঁস ফোঁস শব্দ করছে মাঝে মাঝে। আর কিছু করছে না। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম। চুপটি করে বসে রইলাম। ভাবলাম কোথা থেকে এসেছে, আপনিই চলে যাবে। এ বুনো হাতী নয়, পোষা হাতী। প্রায় মিনিট দশেক কেটে গেল। হাতী কিন্তু নড়ে না। ক্রমাগত শুঁড় দোলাচ্ছে আর কান নাড়ছে। আরও মিনিট দশেক কেটে গেল। কি করব

ভাবছি। এমন সময় হাতীটা এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। হঠাৎ সে আকাশের দিকে শুঁড়টা তুলে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর শুঁড়টা নামিয়ে আমার মশারির ভিতর শুঁড়টা ঢুকিয়ে দিল। শুঁড়ে একটি রুদ্রাক্ষের মালা ছিল, সে মালাটি পরিয়ে দিল আমার গলায়। শুঁড়ের ভিতর থেকে টক্ করে কি একটা পড়ল আমার কোলের উপর। তুলে দেখি শ্বেতপাথরের ছোট শিবলিঙ্গ একটি। সঙ্গে সঙ্গে আমার সব মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল আমি গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক আর এটি হচ্ছে আমার প্রিয় হস্তী মৈনাক।

বললাম, 'মৈনাক কি খবর?'

সঙ্গে সঙ্গে মৈনাক হাঁটু গেড়ে বসল। আর তার শুঁড়টি বেঁকিয়ে ধরল। আমি তার শুঁড়ে পা রেখে হাওদায় গিয়ে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল সে। গজেন্দ্রগমন নয়,—ছুটতে লাগল মৈনাক। কত মাঠ বন নদী গিরি পার হয়ে গেলাম। রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল। মৈনাক তবু থামে না। দিনের আলোয় দেখলাম চমৎকার এক দেশ। চারিদিকে প্রাচুর্য, চারিদিকে সৌন্দর্য। কত মন্দির, কত হর্ম্য, কত জলাশয়, কত বাগান পার হয়ে গেলাম। মৈনাককে দেখে রাস্তার লোক সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিতে লাগল। জয় মহারাজ শশাঙ্কের জয়, জয় মহারাজ শশাঙ্কের জয়—জয়ধ্বনিতে প্রকম্পিত হতে লাগল চারিদিক। মৈনাক কিন্তু এক নিমেষের জন্য থামে নি। সে ছুটে চলেছে। সমস্ত দিন ধরে সে ছুটল। তারপর সূর্য যখন অস্ত গেল, অন্ধকার রাত্রি নামল তখন বিরাট এক জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল মৈনাক। শুঁড় দিয়ে বড় বড় গাছের ডাল ভেঙে পথ পরিষ্কার করতে করতে এগিয়ে চলল জঙ্গলের ভিতর। কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলাম একটি পরিষ্কার জায়গায় চিতা জ্বলছে। আর চিতার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রাজ্যশ্রী। আমি রাজ্যশ্রীকে ভালবাসতাম কিন্তু তার ভাই রাজ্যবর্ধন আর হর্ষবর্ধনের সঙ্গে আমার ঝগড়া ছিল তাই তাকে পাই নি।

বললাম—'রাজশ্রী এখানে কি করছ ?'

'আমি জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন করব। তুমি আমাকে বাধা দিও না।'

'নিশ্চয় দেব।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি মৈনাকেব পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়লাম। হঠাৎ একটা ববশা এসে বিঁধল আমাব বুকে। দেখি বাজ্যবর্ধনের প্রেত দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ ভ্রূকুটিল, চোখে আগুন।'

ঠিক এই সময়ে আমার পৌত্র হুড়মুড় কবে ঘবে এসে ঢুকল।

'দাদু আজ আমাদের প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশন ছিল। দেখ, আমি কি সুন্দর রামায়ণ পেয়েছি।

প্রকাণ্ড কৃত্তিবাসী রামায়ণটা সে রাখল টেবিলের উপর।

সঙ্গে সঙ্গে মাখন সিং যেন উবে গেল। মরা পিন্‌টেল দুটো যেখানে পড়ে ছিল, দেখলাম সে দুটোও নেই সেখানে।

পরদিন খবর পেলাম শিকার করতে গিয়ে মাখনলালের মৃত্যু হযেছে। একটা বনের ভিতর তার মৃতদেহটা পড়ে ছিল।

মিনির চিঠি

সেদিন ভয়ানক গরম। গাছের পাতাটি নড়ছে না। ভন্‌ভন্‌ করছে মশা চতুর্দিকে। বিছানায় খানিকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে নগেনবাবু শেষে ছাদে বেরিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। তখন রাত্রি একটা। নগেনবাবু মার্চেণ্ট অফিসে চাকরী করেন। বিবাহ করেন নি। একাই একটি বাড়ি-ভাড়া করে থাকেন। একটি কম-বাইণ্ড হ্যাণ্ড চাকর আছে। সে সকাল সন্ধ্যা এসে তাঁর কাজ কর্ম করে দিয়ে চলে যায়। রাতে নগেনবাবু একাই থাকেন।

নগেনবাবু ছাদে পায়চারি করতে লাগলেন। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাঁকে। তাঁর বাড়ির সামনে

বেশ একটা বড় 'ডাকবাক্স' ছিল। হঠাৎ তিনি দেখলেন, ডাকবাক্সটা খুব নড়ছে। যেখান দিয়ে চিঠি ফেলা হয়—সেখানকার ঢাকনাটা খট্‌খট্‌ করে শব্দ করছে। তারপর সেটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ডাক-বাক্সের ভিতর থেকে সোঁ সোঁ করে আওয়াজ হতে লাগল একটা। মিনিট খানেক পরে থেমে গেল। নগেনবাবু দেখলেন একটি লম্বা শীর্ণ লোক ডাকবাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ আবির্ভূত হল যেন শূন্য থেকে। অবাক হয়ে গেলেন নগেনবাবু।

আলসের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে বললেন, 'কে তুমি?' লম্বা শীর্ণ লোকটা মুখ তুলে চাইল।

কাছেই একটা ল্যাম্প-পোষ্টও ছিল। তার আলোয় নগেনবাবুর মনে হল একটা মনুষ্যরূপী কঙ্কাল তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

'ওখানে কি করছ এত রাতে?' লোকটা অন্তর্ধান করল। নগেনবাবু অবাক হওয়ার অবসর পেলেন না, ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ পর মুহূর্তে লোকটা এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

'আমাকে কিছু বলছেন?'

'ওখানে কি করছিলে এত রাতে?'

'দেখছিলাম ঐ ডাকবাক্সে মিনির চিঠি আছে কিনা।'

'ডাকবাক্সের মধ্যে চিঠি আছে কি-না দেখবে কি করে?'

'আমি ওর ভিতর ঢুকে ছিলাম যে।'

'ঢুকেছিলে? কি করে?'

'বাতাস হয়ে'

নগেনবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। লোকটি বললে, 'আমি দিন পনেরো আগে মারা গেছি। মাসখানেক আগে মিনিকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। রোজই আশা করতুম উত্তর আসবে। কিন্তু হঠাৎ মরে গেলাম। উত্তর পেলাম না। যে বাসায় আমি থাকতাম—সেখানে রোজই গিয়ে দেখে আসি একবার।

আমার লেটারবক্সে কোন চিঠি নেই। তখন রাস্তার ডাকবাক্সগুলো খুঁজে খুঁজে দেখি—মিনির চিঠি কোথাও আছে কিনা।'

অবাক হয়ে শুনছিলেন নগেনবাবু।

'কাছাকাছি আর কোথায় ডাকবাক্স আছে বলতে পারেন?'

নগেনবাবু এ কথার উত্তর দিলেন না।

প্রশ্ন করলেন 'আপনি মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ, পনেরোদিন আগে। হঠাৎ হার্ট্-ফেল ক'রে। সেজন্য আমার দুঃখ নেই। এ বাজারে বেঁচে থেকে সুখ কী বলুন? কিন্তু আমার দুঃখ মিনির উত্তরটা আমি জানতে পারলাম না। মিনির বাড়িও আমি গিয়েছিলাম। কাউকে দেখতে পেলাম না। কলসা গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় মিনি আর তার মা থাকত। গিয়ে দেখি বাড়িতে কেউ নেই। হয়ত কোথাও বেড়াতে গেছে। দানাপুরে তার মামা থাকে শুনেছিলাম।'

'আপনি মরে গিয়েও ওই দেহ ধারণ করতে পেরেছেন?'

'পেরেছি। সবাই পারে না। মনের খুব জোর চাই। যতক্ষণ দেহধারণ করে থাকি খুব কষ্ট হয়। অধিকাংশ সময়ই হাওয়া হয়ে থাকি আমি। চললুম, আরো অনেক ডাকবাক্স খুঁজতে হবে আমাকে। মিনি নিশ্চয় উত্তর দিয়েছে। কোথাও না কোথাও আছে, সেই উত্তরটা খুঁজে বার করতে হবেই আমাকে।'

'আপনার নামটি কি?'

'এখন নাম ভূত। আগে ছিল শিবেন।'

শিবেনের প্রেতাত্মা নিমেষে অন্তর্ধান করল।

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নগেনবাবু।

ঠিক করলেন বাড়িওয়ালাকে 'নোটিশ' দেবেন কাল। এবাড়িতে থাকা নিরাপদ নয়।

না, সব প্রেতাত্মা দেহ ধারণ করতে পারে না। কিন্তু যারা অতৃপ্ত কামনা নিয়ে মরে, তারা নানাভাবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। আমরা বুঝতে পারি না সবসময়। নিতাই বুঝতে পারছিল না। নিতাই সেদিন রাত্রে খোলা জানলার সামনে বসে পড়ছিল, জানলার দু'পাশ বেয়ে বেড়ে উঠেছে মালতীলতাব ঝাড়। সেই মালতী লতার পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে যে আকুলতা জাগলো —যে শিহরণ বয়ে গেল, যে দোলা লাগল, তা নিতাই-এর মনে কোনো সাড়া তুলল না। সে বুঝতে পারল না—মিনি কথা বলছে। সে ভাবল, হাওয়ার জন্য মালতী লতাটা দুলছে। সে যদি লক্ষ্য করত—তাহলে দেখতে পেত অন্য গাছের পাতা নড়ছে না। মালতী লতার সেই আকুল আলোড়ন নিতাইকে বলতে চাইছিল, 'ও নিতাই দা, তুমি শিবেনবাবুকে লিখে দাও আমি তার চিঠি পেয়েছিলাম। কিন্তু উত্তর দেবার সময় পাইনি। তুমি তো জানোই কী হয়েছিল। তোমরা তো কেউ আমাদের বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে এলে না। গুণ্ডার দল আমাকে আর মা-কে নিয়ে চলে গেল। আমার উপর, মায়ের উপর যে অত্যাচার তারা করেছে—তা অকথ্য। তাদের সঙ্গে লড়তে লড়তে আমি মরেছি। আমি মরে গেছি এই খবরটা তুমি শিবেনবাবুকে শুধু জানিয়ে দাও। আর জানিয়ে দাও —যে কথাটা লজ্জায় তাকে জানাতে পারি নি, সেই কথাটা এখন বলেই বা কি হবে। এখন বলে তো কোন লাভ নেই। আমি যে তার নাগালের বাইরে চলে গেছি, আমি মরে গেছি। এ কথাটা তাকে জানিয়ে দাও। তিনি আমার উত্তরের অপেক্ষায় বসে আছেন।'

নিতাই কিন্তু তন্ময় হয়ে 'ডিটেকটিভ' বই পড়তে লাগল। মালতীলতার এই আকুলিবিকুলি তার নজরে পড়ল না। মিনি আর তার মা-কে যে গুণ্ডারা হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল—তা সে জানত। কিন্তু এ নিয়ে সে তেমন উত্তেজিত হয়নি। উত্তেজিত হয়েছিল

সেদিনকার ক্রিকেট খেলার ফলাফল নিয়ে। গ্রামের কোন লোকই গুণ্ডাদের খোঁজে বোরায় নি। সবাই গা বাঁচিয়ে ঘবে বসেছিল। নিতাইও ও নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। মিনিরা নিতায়েব দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। তবু ঘামায় নি। মালতীলতাটা রোজই কিন্তু আন্দোলিত হচ্ছিল তার চোখের সামনে। নিতাই-এর মনে সাড়া জাগল না। একদিন দেবতা কিন্তু সদয় হলেন। রাত্রে ভীষণ ঝড় উঠল একটা। মালতী গাছটার ফুল, লতা-পাতা ঝড়ের বেগে ছিঁড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল শিবেনেব ওপব। শিবেন তখন আব একটা ডাকবাক্স থেকে বেরিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছিল। মালতীলতার ছেঁড়া ডালপালা আব ফুলগুলো তাঁকে ঘিবে ঘিরে ঘুবতে লাগল আকুল হয়ে। শিবেন কিন্তু বুঝতে পারলনা যে তার উত্তর এসেছে।

বহুরূপী

পাকা আমটির বুকে তীক্ষ্ণ ছোবার মতো যখন দাঁড়কাকের ঠোঁটটা প্রবেশ করল তখন আম যন্ত্রণায় শিউবে উঠল। কিন্তু কিছু বলল না, কাবণ তার ভাষা নেই।

পরমুহূর্তেই দুম্ কবে শব্দ হল একটা।

গুলি খেয়ে পড়ে গেল দাঁড় কাকটা।

আম ভাবল—যাক্ ভগবান আছেন তাহলে।

ন্যায়বিচার এখনও হয় পৃথিবীতে।

পরদিন কিন্তু ন্যায়বিচাব এবং ভগবান আব একরূপে দেখা দিলেন।

একটি লোক গাছে উঠে আমটিকে মুচড়ে ছিঁড়ে নিল বোঁটা থেকে। পুরল একটি থলের ভিতর। সেখানে আরও অনেক ছিন্নবৃন্ত আম রয়েছে। একটু পরে তাদের নিয়ে গিয়ে স্তূপীকৃত করা হল পাকা মেজের উপর।

কে একজন বললেন—"যে আমগুলোকে কাকে ঠুকরেছে সে গুলোকে আলাদা কর। ওগুলো রস নিঙড়ে নিঙড়ে রাখ এই পাথরের বাটিতে। ওগুলো দিয়ে আমসত্ত্ব হবে—"

পরদিন আমের রস প্রখর রোদে পুড়তে লাগল।

আমের আইন, কাকের আইন আর মানুষের আইন এক নয়।

আইন বহুরূপী।

ভাটিয়ালী

কবি কাঁকনকুমারের পঞ্চাশতম জন্মদিবসে ঘটনাটি ঘটিল।

কিছুদিন আগে তাঁহার প্রথম কবিতার বই 'তন্বী' প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি কাঁকনকুমার তেমন খ্যাতিমান হইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার জন্মদিনে বাহিরের লোক বড় একটা আসিত না। সেদিন কিন্তু একটি লম্বা-চওড়া স্থূলকায়া মহিলা তাঁহার 'তন্বী' কাব্যটি লইয়া উপস্থিত হইল।

'আমাকে চিনতে পারছ ?'

'না'

'আমি রেণু—যাকে নিয়ে তুমি এই কবিতাগুলি এককালে লিখেছিলে—!'

'তোমার স্বামী এখন কোথা—'

'বম্বেতে। চামড়ার ব্যবসা করেন'

রেণু সামনের নড়বড়ে চেয়ারটি টানিয়া বসিল।

ক্যাঁচ করিয়া শব্দ হইল একটা।

কাঁকনকুমারের বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল। চেয়ারটি যদি ভাঙিয়া যায় দ্বিতীয় চেয়ার কিনিবার সঙ্গতি তাঁহার আপাতত নাই

শঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ারটার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অদূরদর্শী নিমাই

বেপরোয়া লোক ছিল নিমাই সামন্ত। শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে অদূরদর্শী। সে ভবিষ্যৎ ভাবত না, বর্তমানই তার কাছে সব ছিল। বর্তমান মুহূর্তের আনন্দের শিখরে চড়বার জন্যে সে সদা উৎসুক হয়ে থাকত। আনন্দও নানা রকম। একবার এক খোঁড়া বুড়ি তবকারির ঝুলি নিয়ে অতি কষ্টে পথ চলছিল। তাকে দেখে নিমাই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

"মা, খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি ?"

"হচ্ছে বই কি। কিন্তু কি করব বল। সবই অদেষ্ট—"

"আমি একটা রিকশা ডেকে দিচ্ছি, আপনি তাতে চড়ে চলে যান।"

"আমি গরিব মানুষ বাবা। রিকশার পয়সা কোথা পাব।"

"রিকশার পয়সা আমি দিয়ে দিচ্ছি—"

একটা রিকশা থামিয়ে তাতে জোর করে তুলে দিয়েছিল সেই বুড়িকে। ভাড়াও দিয়ে দিয়েছিল রিকশার।

একদিন হঠাৎ এক ঠোঙা জিলিপি এনে উপস্থিত আমার বাড়িতে।

"কি রে কি ব্যাপার ?"

"জিলিপি এনেছি। অনেকদিন পরে ছকু জিলিপি ভেজেছে আজ। খেয়ে দেখ, অপূর্ব—"

"এত আনলি কেন ?"

"সবাই মিলে খাওয়া যাবে।"

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে ছিল নিমাই। কিন্তু সে ছিল দিলদরিয়া লোক। সুতরাং চতুর্দিকে ধার ছিল তার। তার এই স্বভাবের জন্য সবাই তাকে ধার দিতও।

হঠাৎ একদিন এসে বললে—"চল্ তাজমহল দেখে আসি। পরশু পূর্ণিমা। আজই চল্।"

"অত টাকা কোথায় পাব?"

"আমি আমার পুরনো সেকেলে পালং-খাটটা বিক্রি করে শ' দুই টাকা পেয়েছি—"

"অমন সেগুন কাঠের খাটটা বেচে ফেললি মাত্র দু'শ টাকায়! ওর দাম অন্তত হাজার টাকা—"

"আরও বেশি। ও খাটে হাজার হাজার ছারপোকাও আছে। সেগুলো কি একেবারে মূল্যহীন? যত দামই হোক, আমার দরকার ছিল দুশো টাকার। চল্ আগ্রা ঘুরে আসি—"

আর একদিনের কথা মনে পড়ছে।

সেদিন আমরা দুজনে বাজারে গিয়েছিলাম মাছ কিনতে। নিমাই দেখলাম এক জোড়া চমৎকার পাম্‌শু পরে এসেছে।

"এটা কবে কিনলি?"

"কাল বিকেলে। দাম নিয়েছে পঞ্চাশ টাকা। অনেকদিন থেকে পরবার শখ ছিল। শখটা মিটিয়ে নিলাম কাল। বাঃ—ওই ইলিশটা তো চমৎকার—"

সত্যিই মাছটি চমৎকার। প্রকাণ্ড চওড়া পেটি, মাথাটি ছোট, লেজটিও ছোট। চকচকে রূপোর মতো রং সর্বাঙ্গে। পিঠটি ঈষৎ কালো। একেবারে টাটকা মাছ। কান্‌কো দুটি টকটকে লাল, চোখ দুটি উজ্জ্বল।

নিমাই বললে—"এটাই আমরা নেব। ওজন কর—"

ওজন হল দু' কেজি। দাম চাইল কুড়ি টাকা। আমার কাছে দশ টাকা ছিল। নিমাইয়ের কাছে পাঁচ টাকা।

নিমাই প্রশ্ন করলে—"ডিম নেই তো? কেটে দেখাও—"

মেছুনি মাছটা কেটে দেখিয়ে দিলে ডিম নেই। এর পর মাছ না নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু টাকা যে কম পড়ছে। কি করা যায়?

হঠাৎ নিমাই বললে, "মাছটার আঁশ ছাড়িয়ে কুটে ফেল। আমি একটা থলি নিয়ে আসি—"

নিমাই চলে গেল। আমি দাঁড়িয়ে মাছ কোটাতে লাগলাম। আমি ভাবলাম নিমাই বুঝি কারো কাছে ধার চাইতে গেল। হয়তো কাছে-পিঠে তার চেনাশোনা কেউ আছে। প্রায় মিনিট কুড়ি পরে নিমাই ফিরল থলি নিয়ে। মাছের দাম মিটিয়ে দিয়ে যখন আমরা বাজার থেকে বেরুচ্ছি তখন হঠাৎ আমার নজরে পড়ল নিমাইয়ের খালি পা। পাম্‌শু পায়ে নেই।

"তোর জুতো কোথা গেল?"

একমুখ হেসে নিমাই বললে—"পাশেই পুরনো জুতোর একটা দোকান আছে। পাঁচ টাকায় বিক্রী করে দিলাম। পয়সা হলে আবার কেনা যাবে। এমন গ্র্যাণ্ড ইলিশটা ছাড়া যায় নাকি!"

নিমাইয়ের মুখ দেখে মনে হল সে আনন্দের শিখরে চড়ে বসে আছে। মনে পড়ল যখন জ্যোৎস্না-স্নাত তাজমহলের দিকে সে চেয়েছিল তখনও তার মুখে এই ভাব দেখেছিলাম।

নিমাই বিয়ে করেনি। বয়স তিরিশের কোটায়। বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান লোক।

একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"বিয়ে করিসনি কেন এখনও? তোর বাবা মা কেউ নেই, নিজেই তো তুই নিজের মালিক। রোজগারও করিস, বিয়ে করিসনি কেন?"

"অঙ্কে মিলল না। তবলাকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু সে বামুনের মেয়ে, আমি অব্রাহ্মণ। তাই তার ডুগী হতে পারলাম না আমি। তবলার বিয়ে হয়ে গেছে, আমি আর বিয়ে করিনি।"

"মেয়ের নাম তবলা?"

"ভাল নাম তমালিনী। আমি তবলা বলে ডাকতুম। বাড়িতে সবাই বলত পুঁটি। তবলাটা ছিল আমার আড়ালের আদরের নাম।"

এর প্রায় মাস দুই পরে একটা ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে হাজির হল নিমাই।

"বিয়ে করছি ভাই। তবলাই সম্বন্ধ করেছে। ঠিক তার শ্বশুর-বাড়ির পাশেই মেয়েটির বাড়ি। খুব গরিব নাকি। আমাদের স্বজাতি। তবলা লিখেছে তোমাকে জীবনে কখনও কোনও অনুরোধ করিনি। এই অনুরোধটি করছি। গরিবের দায়টি উদ্ধার কর। খুব লক্ষ্মী মেয়ে। তবলার অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। তার একটি খোকা হয়েছে। তোকে বরযাত্রী যেতে হবে ভাই।"

বরযাত্রী গিয়েছিলাম।

বিবাহ-বাসরে তবলাও এসেছিল। পাশেই তার বাড়ি। তার খোকাটিকে ঘুম পাড়িয়ে ঘরের ভিতর শুইয়ে শিকল তুলে দিয়ে এসেছিল সে। নিমাইকে বলছিল, "এবার আর খামখেয়ালীপনা করা চলবে না তোমার। লক্ষ্মী হয়ে থাকতে হবে—"

নিমাই হেসে উত্তর দিয়েছিল—"মেয়েরাই লক্ষ্মী হয়। পুরুষরা বড় জোর নারায়ণ হতে পারে। নারায়ণের কিন্তু সমুদ্রে শয্যা—"

বিয়ের লগ্ন এসে গেল। বর-কনেকে পিঁড়িতে বসান হল। পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করতে যাবেন এমন সময় হই-হই শব্দ উঠল বাইরে—আগুন—আগুন—আগুন লেগেছে।

তবলার বাড়িতেই আগুন লেগেছিল। তাদের খড়ের চাল। যে ঘরে তবলার খোকা ছিল সেই ঘরটা দাউ-দাউ করে জ্বলছে।

তবলা আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—"আমার খোকন যে ওই ঘরে রয়েছে—"

নিমেষের মধ্যে নিমাই উঠে পড়ল বরের আসন থেকে। ছুটে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুনের মধ্যে। হায় হায় করে উঠল সবাই।

অনেকক্ষণ পরে জল দিয়ে যখন আগুন নেবানো হল তখন দেখা গেল অঙ্গার স্তূপের নীচে নিমাই উপুড় হয়ে তবলার খোকাটিকে বুকে আঁকড়ে ধরে আছে। খোকা বেঁচে আছে, কিন্তু নিমাইয়ের মাথা পিঠ গা সব পুড়ে গেছে। সে আর বাঁচল না।

খোকনের বন্ধু

খোকন যখন খুব ছোট ছিল তখন একটা বাঘের বাচ্চা পুষেছিল সে। খোকন যখন তার সঙ্গে খেলা করত তখন তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলত—গাঁউ, গাঁউ, গাঁউ। তার দেখাদেখি বাঘের বাচ্চাটাও ঠিক ওই রকম তিনবার বলত—গাঁউ, গাঁউ, গাঁউ। এইটে তাদের প্রধান খেলা ছিল। বাঘের খাঁচার সামনে খোকন হামাগুড়ি দিয়ে বাঘ সেজে বলত গাঁউ গাঁউ গাঁউ। বাঘটাও উত্তর দিত গাঁউ গাঁউ গাঁউ। খোকনের সঙ্গে খুব ভাবও হয়েছিল বাচ্চাটার। খোকন তার নাম রেখেছিল বাচ্চু। বাচ্চু কিন্তু একদিন পালিয়ে গেল। খাঁচার দরজাটা ভালো বন্ধ ছিল না। পালিয়ে গেল বাচ্চু। রাত্রিবেলা কখন পালিয়ে গেছে টের পায় নি কেউ। সকালে উঠে দেখা গেল বাচ্চু নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হল। বাচ্চুকে কিন্তু আর পাওয়া গেল না।

এর পর প্রায় দশ বছর কেটে গেছে।

বাচ্চু যখন পালিয়েছিল তখন খোকনের বয়স ছিল বারো। এখন সে বাইশ বছরের যুবক। এম. এ. পাস করেছে। খুব ভালো শিকারীও হয়েছে একজন।

খোকন বড়লোকের ছেলে। তাদের মোটর তো আছেই। হাতী ঘোড়াও আছে। একদিন শোনা গেল পাশের জঙ্গলে নাকি বাঘ এসেছে। গরু বাছুর বা মানুষ মারে নি কিন্তু তার হুঙ্কারে অস্থির হয়ে উঠেছে সবাই। খোকন একদিন হাতীতে হাওদা কষে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এর আগে সে বাঘ শিকার করে নি। ভালুক মেরেছে, শুয়োর মেরেছে, বাঘ মারে নি। তার মনে হল এবার যখন বাড়ির কাছের জঙ্গলে বাঘ এসেছে চেষ্টা করে দেখা

যাক। বাড়ির কাছে মানে খুব কাছে নয়, প্রায় দশ ক্রোশ দূরে। জঙ্গলটি খুব ছোটও নয়। খোকন সঙ্গে জন পঞ্চাশেক 'বীটার'ও নিয়ে গেল। বীটাররা চারদিকে হৈ হল্লা করে চারদিকের জঙ্গলে লাঠি-পেটা কোরে বাঘটাকে ঝোপ-ঝাপের ভিতর থেকে ফাঁকায় বার করে। বাঘটাকে দেখতে না পেলে তো গুলি করা যাবে না।

'বীটার'রা হইহই করতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। তবু বাঘের দেখা নেই। খোকন হাতীর উপর হাওদায় বসে' ছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল' একটা ঝোপের ভিতর বাঘটা লুকিয়ে বসে' আছে। বাঘের গায়ের খানিকটা দেখা যাচ্ছে ঝোপের ফাঁক দিয়ে। সেইটে লক্ষ্য করে' খোকন 'দুম্' করে' গুলি ছুড়ল একটা। সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ হল—গাঁউ, গাঁউ, গাঁউ আর বাঘটা লাফিয়ে বেরিয়ে এল ঝোপের ভিতর থেকে। গুলিটা ঠিক লাগে নি। সামনের একটা থাবায় ছড়ে' গিয়েছিল একটু।

ঝোপের বাইরে এসে সেই থাবাটা তুলে বাঘটা আবার চেঁচিয়ে উঠল—গাঁউ, গাঁউ, গাঁউ।

খোকনের মনে পড়ে গেল সব।

'কে বাচ্চু—?'

কি আশ্চর্য—বাচ্চুও উত্তর দিলে মানুষের ভাষায়।

"হ্যাঁ আমি বাচ্চু। আমাকে তুমি মারলে খোকন।"

আবার থাবাটা তুলে দেখাল সে।

"তুমি বাংলা শিখলে কি করে?"

"একজন বাঙালী সাধুর বরে। আমি তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলাম। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব বলেই এই জঙ্গলে এসেছি। আর তুমিই এসে আমার উপর গুলি চালিয়ে দিলে। আশ্চর্য কাণ্ড।"

খোকনও বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। বললে—'আমি বুঝতে পারি নি। অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি আমাদের বাড়ি চল।'

'বেশ চল—'

'তুমি হাতীতে চড়তে পারবে? হাওদায় আমার পাশে এসে বস

'আমার আপত্তি নেই।'

হাতীটা কিন্তু ঘোর আপত্তি করতে লাগল। সে বাচ্চুকে দেখে তেড়ে গেল এবং শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড় মারবার চেষ্টা করতে লাগল। মাহুতটা অনেক কষ্টে সামলে রাখলে তাকে। খোকন তখন হুকুম দিলে, বাচ্চুকে পালকি করে' নিয়ে এস।

খোকন হাতী চড়ে বাড়ি ফিরে গেল। তারপর প্রকাণ্ড একটা বড় পালকি আর আটজন বেহারা পাঠিয়ে দিলে বাচ্চুকে আনবার জন্য। বেহারাও সহজে যেতে চায় কি? অত বড় একটা জাঁদরেল বাঘকে পালকি করে' আনা সহজ না কি। প্রথমে কেউ ভয়ে যেতে চায় নি। শেষে খোকন বলল, "বেশ চল আমি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি। ও আমার বন্ধু, তোমাদের কিছু বলবে না।" খোকন ঘোড়ায় চড়ে' গেল তাদের সঙ্গে।

জঙ্গলে গিয়ে দেখে বাচ্চু থাবা তুলে তার অপেক্ষায় বসে' আছে আর মাঝে মাঝে থাবাটা চাটছে।

"রক্তটা বন্ধ হচ্ছে না ভাই।"

"ছিদাম ডাক্তার সব ঠিক করে' দেবে, তুমি পালকির ভিতর ঢোক। বেহারাদের ভয় দেখিও না যেন।"

বাচ্চু লক্ষ্মীর মতোই ঢুকল পালকিতে।

বেহারারা তাকে হুম্‌ব্রো হুম্‌ব্রো করে' নিয়ে এল খোকনের বাড়িতে।

নীচের হলটাতে ভালো একটা পালং খাট ছিল। তার উপর ভালো বিছানা করে' শোয়ানো হল বাচ্চুকে। খোকন বাচ্চুর পিঠের দিকে একটা বড় তাকিয়াও দিয়ে দিলে। বাচ্চু তাকিয়া ঠেস দিয়ে থাবা উঁচু করে' বসে রইল

একটু পরে ছিদাম (শ্রীদাম) ডাক্তার এলেন। রোগী দেখে

তাঁর চক্ষু তো চড়কগাছ। ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন। বললেন—'ঐ রুগীর আমি চিকিৎসা করতে পারব না।'

বাচ্চু হেসে উঠল ঘাঁউ ঘাঁউ করে'। তারপর বললে—"ছি, ছি এত ভীতু আপনি। আপনি শুধু দেখে দিন হাড়টাড় ভেঙেছে কি না! হাড় যদি না ভেঙে থাকে আমি চেটে চেটেই সারিয়ে ফেলব আমার ঘা। আপনি শুধু দেখুন হাড়টা ঠিক আছে কি না।"

থাবাটা আর একটু বাড়িয়ে দিল বাচ্চু। ছিদাম ডাক্তার অতি ভয়ে ভয়ে গিয়ে সামান্য নেড়ে চেড়ে পরীক্ষা করলেন সেটা। তারপর বললেন—"না হাড় ভাঙে নি। চামড়ার ওপরটা একটু জখম হয়েছে। আমি একটা ভাল মলম দিচ্ছি সেইটে দিয়ে বেঁধে রাখুন, ভালো হয়ে যাবেন—"

ভয়ের চোটে ছিদাম ডাক্তার বাচ্চুকে 'আপনি' বলতে লাগলেন। তারপর বাইরে গিয়ে খোকনকে বললেন—"আমি একটা মলম আর ব্যাণ্ডেজ পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমিই লাগিয়ে বেঁধে দিও। আমি ওই প্রকাণ্ড বুনো বাঘের থাবায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে পারব না। তুমি বলছ, ও তোমার বন্ধু। তুমিই ব্যাণ্ডেজটা করে দাও—"

ছিদাম ডাক্তার কিছুতেই আর বাচ্চুর কাছে গেল না। খোকনই ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে দিল।

তারপর খোকন প্রকাণ্ড এক গামলা মাংসের কোর্মা এনে যখন বাচ্চুকে খেতে বলল তখন বাচ্চু মাথা নেড়ে গাঁউ গাঁউ গাঁউ করে' উঠল।

"আমি ও মসলা দিয়ে রান্না মাংস খাব না। ছেলেবেলায় তোমার কাছে যখন ছিলাম তখন মসলা দেওয়া মাংস খেয়ে খেয়ে আমার অর্শ হয়ে গিয়েছিল। জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে আমাদের ডাক্তার ভালুককে ধরলাম। সে কিছু গাছগাছড়া খাইয়ে আমাকে ভালো করে' দিয়েছে —আর বলেছে খবরদার আর কখনও মসলা দেওয়া কোন জিনিস খেও না। আমাকে খানিকটা কাঁচা মাংস এনে দাও।"

খোকন তখন তার জন্যে রোজ একটা খাসি বন্দোবস্ত করে' দিল। বাচ্চু রোজ প্রায় সাত আটসের কাঁচা মাংস খেত। খোকন বাচ্চুকে খুব আরামে রেখেছিল। তখন গ্রীষ্মকাল। বাচ্চুর মাথার উপর ইলেকট্রিক পাখা ঘুরত। খোকনের বাথরুমে প্রকাণ্ড একটা স্নান করবার চৌবাচ্চা ছিল। তাতে রোজ ঠাণ্ডা জল ভরে' দিত চাকররা। বাচ্চু খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে জল খেয়ে আসত সেখানে। থাবার ঘা যখন ভালো হয়ে গেল তখন সে চৌবাচ্চার ভিতর নেমে স্নানও করত। খোকন ছাড়া আর কেউ কিন্তু যেত না তাব কাছে। খোকনের বিয়ে হয়েছিল। বাচ্চু একদিন বললে—তোর বৌকে নিয়ে আয় না আমার কাছে, একটু আলাপ করি। বউ কিন্তু ভয়ে এল না।

বাচ্চু মাসখানেক ছিল খোকনের কাছে। তার থাবা যখন বেশ সেরে গেল তখন সে একদিন খোকনকে বললে, 'ভাই এবার আমি বনে ফিরে যাব।'

"বনে যাবে কেন। এখানেই থাকো। বনে তো নানা কষ্ট।"

বাচ্চু বললে—"কিন্তু বনে স্বাধীনতা আছে। বনে সত্যিই অনেক কষ্ট। অনেক দিন খাওয়া জোটে না। অনেক সময় শিকারীরা তাড়া করে। কিন্তু বনে স্বাধীনতা আছে। আমি মাঝে মাঝে তোমার খবর নেব। তুমি হরিণের মাংস ভালবাস?"

"খুব। কিন্তু এখানে পাই না তো।"

"আমি তোমাকে মাঝে মাঝে দিয়ে যাব। এখন চললুম—"

বাচ্চু এক লাফে জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রায় দিন পনেরো পরে খোকন একদিন রাত্রে শুনতে পেল তাব বাড়ির গেটের সামনে বাচ্চু গাঁউ গাঁউ গাঁউ করছে। খোকন গিয়ে দেখে বাচ্চু নেই একটা মরা হরিণ পড়ে, আছে।

বাচ্চু মাঝে মাঝে এমনি ভাবে লুকিয়ে হরিণ দিয়ে যেত খোকনকে।

খোকনকে অনেক হরিণ খাইয়েছিল সে। তারপর হঠাৎ তার আসা বন্ধ হয়ে গেল। এক বছর কেটে গেল, বাচ্চু আর আসে না।

একদিন সকালে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এলেন। এসে বললেন—আমি খোকনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

খোকন বেরিয়ে এল।

সন্ন্যাসী বললেন—'আপনার বন্ধু বাচ্চু আপনার স্ত্রীর জন্য এটি উপহার পাঠিয়েছে—'

তিনি তাঁর ঝোলার ভিতর থেকে হাঁসের ডিমের মতো একটা মুক্তো বার করে খোকনের হাতে দিলেন।

'কি এটা?'

'আসল গজমুক্তা।'

'বাচ্চু কোথা পেলে?'

'জঙ্গলে এক হাতীর সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়েছিল। বাচ্চু হাতীর মাথায় চড়ে মাথাটা ফেড়ে ফেলেছিল। তার ভিতর এই মুক্তাটা ছিল। বাচ্চু ওটা মুখে করে' তুলে এনে দিল আমাকে, আর বলল আপনি এটা আমার বন্ধু খোকনের বৌকে দিয়ে আসুন। সেইজন্য আমি এসেছি।'

"বাচ্চু কোথায়?"

'"দাঁতাল হাতীটা তার পেটে দাঁত ঢুকিয়ে দিয়েছিল। মুক্তোটা আনবার পর বেশীক্ষণ সে আর বাঁচে নি।'

"আপনার পরিচয় দিন।"

"আমিও বাচ্চুর বন্ধু একজন। বনে তপস্যা করি। একবার একটা ময়াল সাপ আমাকে জাপটে ধরে। বাচ্চু বাঁচিয়ে ছিল আমাকে। তাই ওকে বর দিয়েছিলাম—তুমি বাংলায় মনোভাব প্রকাশ করতে পারবে। বাচ্চু বড় ভালো ছিল—"

"আপনি ওকে বাঁচাতে পারলেন না?"

"ওর পরমায়ু ফুরিয়েছিল। পরমায়ু ফুরিয়ে গেলে আর বাঁচানো যায় না।"

বারান্দা

প্রসন্নবাবু সেদিন প্রথমে চুপ করেছিলেন। হঠাৎ কথা বলতে আরম্ভ করলেন। সবাই থেমে গেল।

প্রসন্নবাবু বললেন—এই বারান্দারই উপর পঞ্চাশ বছর আগে ও এসে দাঁড়িয়েছিল, আমার পাশে। পরণে লাল চেলি, মাথায় সিঁদুর, হাতে রূপোর কাজল-লতা, পায়ে রূপোর মল আর পাঁয়জোর। আমার বোনরা এক কলসী জল এনে তুলে দিয়েছিল ওর কাঁখে। হাতে ধরেছিল একটা জীবন্ত ন্যাটা মাছ। উলুধ্বনি হচ্ছিল, শাঁখ বাজছিল। আমার মা বরণ করছিলেন ওকে। ও ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল।

এই বারান্দাতেই ও গরীব দুঃখীদের বসিয়ে খাওয়াত। আমার বড় ভাগনা বিবলু যখন মারা গেল, তখন এই বারান্দাতে তার খাট বিছানো হয়েছিল।

এই বারান্দা দিয়েই আমার বড় মেয়ে শ্যামা নেমে চলে গিয়েছিল একদিন। কোথায় গিয়েছে আজও জানি না। এই বারান্দাতেই ও রাত্তিরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত শ্যামার আশায়। শ্যামা আর ফেরেনি।

এই বারান্দাতেই দীনুর বিয়ের সময় শানাই-ওয়ালারা বসেছিল। চমৎকার পূরবী আর ইমন বাজিয়েছিল তারা। এই টম—রাস্তায় নেড়ী কুত্তোর বাচ্চা—এই বারান্দাতেই উঠে বসে কুঁই কুঁই করছিল। টমকে তাড়িয়ে দেয় নি ও।—মানুষ করেছিল।

বারান্দার ওপাশে হাস্নুহানা গাছটা ওই লাগিয়েছিল। বেল ফুলের গাছ লাগিয়েছিল বারান্দার নীচে। ওপাশে পুঁতেছিল বেগুন চারা, শিমগাছ।

এই বারান্দায় রোদ এসেছে কত। জ্যোৎস্নাও এসেছে। ফুলের গন্ধ নিয়ে কত হাওয়া এসেছে গেছে। ও তাদের উপভোগ করবার সময় পেত না। সংসার নিয়ে বড্ড ব্যস্ত থাকতে হত সর্বদা। কারো পান থেকে চুণটি খসতে দেয়নি।

এই বারান্দার এই দড়িতে ওর কত শাড়ি শুকিয়েছে। এই বারান্দায় বসে ও বড়ি দিয়েছে।

ছেলেদের সরস্বতী পূজার সময় আলপনা দিয়েছে।

কত আর বলব? স্মৃতি কি একটা? অজস্র। নাও, এবার তোমরা ওঠাও।

বল হরি হরি বোল—

প্রসন্নবাবুর স্ত্রীর শব দেহকে নিয়ে চলে গেল পাড়ার ছেলেরা।

প্রসন্নবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

টম্ কুকুরটা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল।

এর পর ছ'মাসও কাটল না। আর একটি শেষ শয্যা পাতা হল ওই বারান্দার উপর। প্রসন্নবাবু তার উপর শুয়ে মহাযাত্রা করলেন। তারপর? তারপর ওই বারান্দায় কিছুদিন রাতের বেলা শুয়ে ছিল মাতাল দীনু, মুক্তকচ্ছ আলু থালু বেশে। দিনের বেলা ওই বারান্দা দিয়েই আনাগোনা করেছিল দীনুর বন্ধুরা রেসের নানা রকম টিপস নিয়ে। তারপর একদিন গিয়ে শুনলাম বাড়ীটি বিক্রি হয়েছে। বারান্দাটা ভেঙ্গে দোকান হয়েছে। একটা মুখোশের দোকান। নানা রকম মুখোশ পাওয়া যায় সেখানে।

এখন সে দোকানও নেই। বাড়িটাই নেই। ইম্প্রুভমেন্টট্রাষ্ট সেটা কিনে নিয়ে রাস্তা বানিয়েছে সেখানে। ওই জনাকীর্ণ রাস্তাটার অন্তরালে সেই বারান্দাটা হারিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সত্যি হারিয়ে গেছে কি? কিছু কি হারায়?

ঘটনা সামান্য

অকদিন আগেকার ঘটনা। তখন সবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে আমরা স্কুলে পড়ি। আমাদের বাড়ির কাছে আমাদের একটাআমবাগান ছিল। বেজদা ছিল সেই আমবাগানের রক্ষক। বেজদা আসল নাম ছিল ব্রজবিহারী। সেটা ক্রমশ ব্রজ তারপর 'বেজে'ত রূপান্তরিত হয়। আমরা তাকে বেজদা বলতাম। বেজদা বয়স কত ছিল জানি না। মুখে বড় বড় হলুদ রঙের দাঁত ছিল। চোখ দুটি ছিল বড় বড় এবং লাল। চোখের কোণে প্রায়ই পিঁচুটিাকত। বলিষ্ঠ প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিল বেজদা। বাগানে সে এক বাঁশের লগি কাঁধে করে ঘুরে বেড়াত, লগির ডগায় থাকত একটি লি। আম পাড়বার জন্য। কোনও গাছে ডাঁশা বা পাকা আম েলে বেজদা পেড়ে নিত সেটি। বেজদার ভয়ে বাগানে কেউ ঢুকত।। একদিন কিন্তু এক সাহেব এসে ঢুকে পড়ল। তার কাঁধে ন্দুক। আমাদের বাগানে 'সিঁদুরে' নামে একটা আম ছিল। মনে হ আমটির সর্বাঙ্গে কে যেন সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে। খুব টক কিন্তু জোঁদা টক। দেখতে কিন্তু অতি সুন্দর।

হেব বেজদাকে এসে বলল—ওই লাল আম পেড়ে দাও আমক—

াবে?'

্যা?'

ঃ আম খুব টক। চল তোমাকে ভালো মিষ্টি আম দিচ্ছি—'

েজদা কয়েকটি কেলোয়া নাকি আম নিয়ে এল। কোনটাই সিঁদুরে আমের মতো সুদৃশ্য নয়। কেলোয়া কালো, নাকি ঈষৎ হলদে রংয়ের। দুটো আমই কিন্তু খুব মিষ্টি। সাহেব লাথি মেরে আমলো ফেলে দিলে।

'আমি ওই লাল আম চাই।'

'ও আম দেব না। ও আম দিয়ে আচার আমসি চাটনি—এইসব তৈরি হয়। ও আম দেব না।'

'আচ্ছা তোমাকে একটা টাকা দিচ্ছি—'

পকেট থেকে একটা টাকা বার করে টং করে ফেলে দিল মুখ সামনে।

'আম আমরা বেচি না।'

সাহেব তখন বন্দুক উচিয়ে বললে—'না দাও তো গুলি করব—।'

বেজদার হাতে ছিল বাঁশের লগি। সটান বসিয়ে দিলে সাহেবের মাথায়।

তার হাত থেকে বন্দুকটা পড়ে গেল। বেজদা চীৎকার করে উঠল—ওরে কে কোথায় আছিস আয়—একটা সাহেব এসে আমাকে খুন করছে—

আশে-পাশের মাঠ থেকে হৈ হৈ করে এসে পড়ল অনেক লোক। সায়েব বন্দুকটি তুলে নিয়ে দে দৌড়।

আমার বাবা ছিলেন ওখানকার হাসপাতালের ডাক্তার। একটু পরে দারোগা সাহেবের চিঠি নিয়ে এক কনষ্টেবল সঙ্গে সেই সাহেব এসে হাজির হল বাবার কাছে। দারোগা লিখেছেন, এই সাহেবকে একটি লোক মেরেছে। সাহেব এসে থানায় ডায়েরি করেছে। কপাল কেটে গেছে। আপনি এ সম্বন্ধে আপনার মেডিকাল রিপোর্ট পাঠিয়ে দিন। বাবা ক্ষতটি পরীক্ষা করে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। কনেষ্টবলের হাতে মেডিকাল সার্টিফিকেটও দিলেন একটি।

তারপর সাহেবকে বললেন—তুমি আমার বাগানে ঢুকেছিলে। বন্দুক তুলে আমার চাকরকে মারতে গিয়েছিলে বলেই সে তোমাকে লাঠি দিয়ে মেরেছে। বেশী কিছু হয়নি। কপালের চামড়া কেটে গেছে একটু। তুমি আম খেতে ভালবাস?'